



# আবার ছায়াপথ

## ২০২০





## **Specialist in:**

- **Coating**
- **Lining**
- **Painting with CoalTar**
- **Polyurethane &**
- **Epoxy etc.**

G - 2, Sarashwati Subham  
P - 241, Upen Banerjee Road  
Kolkata - 700 060, Tel. : 033 - 24013593

**E-mail : [sonabarsaprojects@yahoo.com](mailto:sonabarsaprojects@yahoo.com)**



# আবার ছায়াপথ ২০২০

**Alumni Association  
National Council of Education Bengal  
and Jadavpur University  
Delhi Chapter**

# From the Editor's desk

The seed of this magazine was perhaps sown in the summer of 2016. At the alumni office, discussion was going on regarding the activities to be undertaken for FY 2016-17. One of the events that came up was 'Bijoya Sammelani'. Some of the newly inducted members of the Executive Committee (including me) suggested that we should think on a larger scale and organize some sort of a get-together. This was a bold proposal as we also suggested that there should be a registration fee for the event, something that had not been done before this for any Alumni event, except for the annual picnic. After detailed deliberation, the Executive Committee accepted the model and it culminated in our 1st Annual Get-Together—an evening of fun and frolic with old friends and their families. The attendance was much higher than we expected. 135 people registered for the event; way more than we had initially anticipated. After a gap of two years, we organized 'Hobnob19' in the same model and this time we crossed the 200 mark in terms of participation. Both these events were grand successes.

Though we tried to make these events profitable for the Alumni through donations and sponsorships, we did not succeed in doing so. Thus, during the initial planning phase of 'Hobnob20', I suggested that we publish a magazine. It would not only showcase the writings of our fellow alumni members, but would also give us the opportunity to collect more money from advertisements and help to generate profit from the event. The idea seemed acceptable to all.

Alas! Destiny had something else in store for us. 'Hobnob20', which was supposed to take place on March 15, 2020, had to be cancelled because of the Covid19 crisis. However, by that time, we had already received a few advertisements and some very good articles from our members. Now the question was, what should be done with them? Should we just drop the entire idea of a magazine? Of course not. That is not the spirit of Jadavpurians. We decided to go ahead with the magazine. In the process, we received many more interesting articles.

I feel extremely proud to present the first annual magazine of AANCEBJU Delhi Chapter. As you will go through it, I am sure that you will be amazed by the variety of topics and the literary skills of our fellow alumni, in the same way as I was.

I sincerely thank all our advertisers for making the publication of this magazine possible. Also, I express my sincere gratitude to Niladri da for his guidance in the entire process, Abhishek for all his help with the designing and printing activities and my wife Binita for helping out with the editing process. And a big THANK YOU to all the writers—without you this would not have been possible!

Lastly, I must say that opinions expressed by authors are personal and do not reflect the standpoint of AANCEBJU-DC. Though utmost care has been taken to avoid any controversial topic, my sincere apologies to any reader whose sentiments might be hurt by any content.

Enjoy the pages that you are about to go through!

**Dr. Rajarshi Bandyopadhyay**

*June 20, 2020*



## **Contents/ সূচী**

Front cover – Shiladitya Majumdar, Pharmaceutical Engineering, 2007  
From the Editor's desk

### **কবিতা**

বাঙলা আমার বংশীবদন  
বোঝাবুঝি  
লকডাউন ও কর্মহীন শ্রমিক  
আত্মজ

6  
7

### **গল্প**

শিকড়  
'মারী' ও মানুষ  
ভুল সবই ভুল

8  
10  
12

### **প্রবন্ধ/ Essay**

বাংলা নাটক- আড়াইশো বছর  
রাঁধার পর খাওয়া, আর খাওয়ার পর রাঁধা  
Important Life Lessons Learnt in a Mountain Trekking to Dzongri Top  
Myth and reality of an ICU – an intensive experience  
The Literacy Disaster in India  
'HELP! PROJECT #COVID-19' and 'Cyclone Amphan Relief Fund Raiser'

14  
17  
19  
22  
24  
26

### **Quiz**

(Extra)Ordinary!

27

### **Reminiscence/ স্মৃতিকথা**

Punnyo  
গ্রামোফোন  
ধর্মাস্তর  
'১৫ই আগস্ট ১৯৪৭' – যেমন দেখেছি  
এক অমূল্য স্মৃতিসঞ্চয়  
Down the memory lane – Arab land Iraq

29  
31  
33  
38  
40  
41

### **রান্না-বান্না**

শাহী কপি ও পেপে চিংড়ি ঘন্টার রেসিপি

48

### **Technical article**

Cyclone resistant architecture for traditional and non-engineered buildings

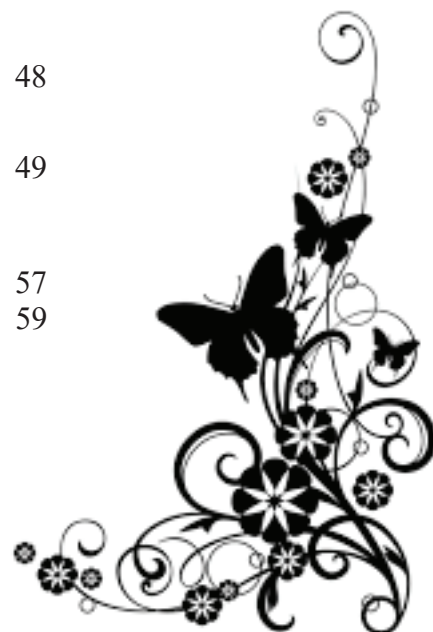
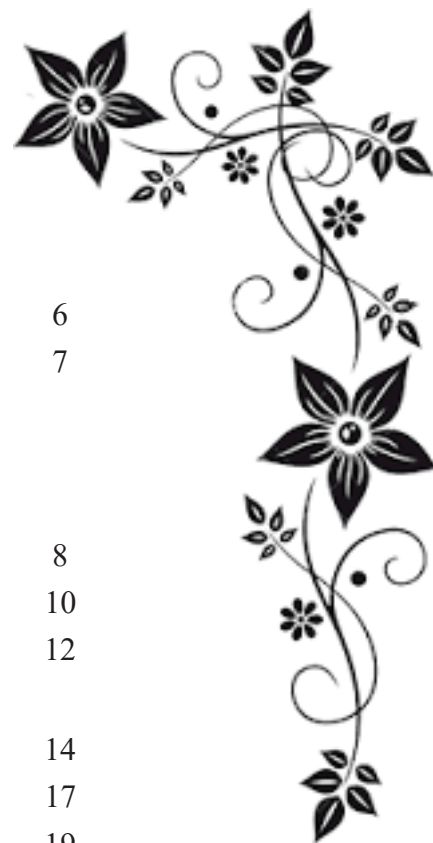
49

### **Travelogue/ ভ্রমণকাহিনী**

Glimpses of trip to Renukaji Lake  
আইসল্যান্ডে কয়েকদিন

57  
59

### **Photographs of Alumni Association activities in recent past**



## বাঙলা আমার বংশীবদন

শীর্ষেন্দু ভট্টাচার্য্য, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ২০১৫

করবা চোখের এক সন্ধ্যাবেলায় "গুরুগ্রাম" এর আলন্দে রিক্সা চেপে বাড় ফিরাছিলাম। হঠাৎ আশেপাশের বাড় থেকে শব্দধবনি ভেসে আসে। বুঝি, চাঁদ উঠেছে। সেই সময় হঠাৎই সারথী মশাই তাঁর অতীত জীবনচর্যার সচ্ছলতা আর বর্তমান পরিস্থিতির টানাপোড়েনের এক "সহজপাঠ" শোনাতে শুরু করেন, পদ্মাপাড়ের বাঙালা ভাষায়। নামটা তাঁর জানা হয়নি; চলুন ধরেনি কুমোরপাড়ার বংশীবদন।

বংশীবদন রিক্সা চালায়  
হরিয়ানার গুরুগ্রামে,  
সস্তা মদের তীব্র নেশায়  
অবসাদের ইতি টানো।  
চতুর্থী চাঁদ জোৎস্না ছড়ায়  
ফ্ল্যাট বাড়িতে উপোস ভাঙে,  
খিদে পেটেও বংশী হাসে,  
শখের উপোস বংশী জানে!!

কুমোরপাড়ার দাওয়ায় বসে  
পোয়াতি বউ হিসেব কষে,  
আসছে পূজায় কদিন বাকি!  
হিসেব হারায় দীর্ঘশ্বাসে।

শীতের আমেজ আভাস জানায়  
দুঃস্বপ্নে - বুকের মাঝে,  
বংশীবদন আগুন জ্বালায়  
বাঁচার নেশায় ছাউনি খোঁজে।  
দিনের শেষে, ঘুমের দেশে  
শিউলি ভোরের স্বপ্ন নামে  
বংশীবদন ফিরবে কবে?  
পদ্মাপাড়ে নিজের গ্রামে.....



## বোঝাবুঝি

সুহান বসু, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ২০০৬

তোর দাদা আর আমার দিদি  
নাকি একই রকম।  
এরা বোঝে বেশি, বলেও বেশি।  
এরা "আহা" কে "এঁয়া" বলে,  
আর ভাল কে ভাল বলার আগে  
সাড়ে তিন মিনিট  
রু সিটকে তাকিয়ে থাকে।  
সোসিয়লজি, সাইকোলজি আর  
প্রাকটিক্যাল শব্দের বানান এরা নাকি  
ছোট থেকেই মুখস্ত না করেই বলতে পারে।  
ঘাসের বুকে শুকছে সায়া, শাড়ি,  
আধ ডুবে কলতানে পুকুর,  
অসমতল আলের রাস্তা ধরে  
দাঁড়িয়ে-টানা-রিক্সাওলার  
রিকশায় বসে, গল্পে গভীর হয়ে  
চলে গেল দাদা আর দিদি।  
তুই আর আমি কি  
এখনো অবুঝ থেকে গেলাম?

## আত্মজ

দীপশিখা ঘোষ\*

তোর ছোট্ট মুঠোয় আমার জীবন বাঁধা  
তোর ছোট্ট ঠোঁটে আমার সব না বলা কথা  
ছোট্ট দুখানি পা একটু একটু এগোয়  
ঐ ছোট্ট পথ চলাতেই আমার সব যাত্রা সারা  
একটু একটু তোর গতি, কি নিদারুন অনুভূতি  
প্রথম শোনা তোর হৃদধ্বনি, যেন আমার বাঁচার রসদখানি  
একটু একটু করে তোর বেড়ে ওঠা  
একটু একটু করে আমার পরিপূর্ণতা ॥

\*সুজিত সরকারের (কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ২০০৬) স্ত্রী

## লকডাউন ও কমহীন শ্রমিক

পরিতোষ সেন\*

দিল্লি থেকে মধ্যপ্রদেশ  
বাড়ি ফেরার পথে,  
হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছয় সে  
আগ্না কোনোমতো।

দুশো কিঃমিঃ হাঁটার পর  
অভুক্ত ক্লান্ত দেহ  
লুটিয়ে পড়ে পথের পাশে  
খোঁজ রাখে কি কেহ?

লকডাউনে কমহীন  
শ্রমিক হাজারে হাজারে  
উৎকণ্ঠায় ফিরতে চায়  
যে যার নিজের ঘরে।

কেমন করে ফিরবে তারা  
বন্ধ ট্রেন বাস  
কে দেবে ভরসা তাদের  
কে দেবে আশ্বাস?

পেটে খিদে শূন্য পকেট  
ফিরতে চায় যারা ঘরে  
করোনার থেকেও ভয়াবহ  
এরা যদি অবহেলায় মরো।

\* প্রসেনজিৎ সেনের (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ২০০৭) বাবা



## শিকড়

জয়িতা সরকার, ইকোনমিক্স, ১৯৯৪

"বাবু ওঠ ওঠ, flight miss হয়ে যাবে যে। আজ ষষ্ঠী যে। কলকাতা যাব তো আমরা।"

মায়ের ধাক্কাধাক্কীতে বেজায় খেপে গেল দীপ।

"কী হচ্ছেটা কী মা? দিলে তো ঘুমটার বারোটা বাজিয়ে"

এই সাত সকালে মাকে একেবারে বঙ্গনারীর সাজে দেখে চোখ গোলগোল করে বলল, "আই স্বাস ম্যাডাম আপনাকে তো চেনাই যাচ্ছেনা। কী ব্যাপার? Date with Dad?"

"চ্যাংড়ামো করিসনা। ওঠ ওঠ। পূজো পূজো গন্ধ বাতাসে। কেউ ঘুমোয় এখন।", দীপের মা আনন্দে একদম বাচ্চা মেয়ের মত ছটফট করছিলেন।

অগত্যা উঠতেই হল।

"জানিনা বাবা why all Bongs are so emotional about Kolkata on

pujo. সেই ভীড়, গরম আর সব অচেনা relatives দেব সাথে public relations.", বিড়বিড় করে দীপ।

"give me a break ma. Next year no Kolkata"

দিল্লীতে বড় হয়ে ওঠা ছেলের কথা শুনে মুচকি হাসেন মা। সময় চলে নিজের নিয়মে।

-----

"দীপদাদা চলো, অঞ্জলির সময় পরিয়ে যাচ্ছে....",

মাসতুতো বোন রিয়ার জোরাজুরিতে দীপ এখন বাড়ির সাবেকী পূজোর মণ্ডপে। এবার পূজোর ৫০ বছর হচ্ছে তাই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মামা মাসিরা সপরিবারে কলকাতায় আর তাই সব cousin ভাই বোনেরা মি লে দীপ-রিয়া-দিয়া-অর্ক-

বুবলাই দেব আড্ডা আর দুষ্টুমির শেষ নেই। দীপ ভুলেই গেছে যে ও এবার পূজোতে দিল্লী ছেড়ে আসতেই চায়নি।

সকালে পাঞ্জাবী পরে অঞ্জলি, দুপুরে ভোগ, সন্ধ্যায় চাকের তালে ধুনুচির নাচ দেখে কে বলবে এই ছেলে কলকাতা bongs বলে নাক সিঁটকাতো।

পূজোর দিনগুলো যেন উড়ে যাচ্ছিল।

-----

"Hi, আমি সায়ালা..... আচ্ছা রিয়া আছে ? আমাকে আসতে বলেছিল আজ....."

হাতে ভোগের বালতি নিয়ে পরিবেশন করছিল দীপ।

একটা মিষ্টি গলা শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো আর ভাবলো হয়ে গেল just. মনে হল একটা ছবির ফ্রেমের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। শরতের সোনালী রোদ্দুরের মত হলুদ শাড়ি পরে এক মাথা খোলা চুলের সরস্বতী যেন দুগ্ধা ঠাকুরের পাশ থেকে নেমে এসে তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রাণপণে উত্তর খুঁজছিল দীপ.... আরে বাংলা ভুলে গেল নাকি সে?

"কী রে দীপদাদা তোরা statue statue খেলছিস নাকি রে? " রিয়ার চিংকারে সম্বিত ফিরতে দীপ বলল,

"আরে তোর বন্ধু ...মানে তোকেই খুঁজছিলাম.... কোথায় যে থাকিস?"

সব গুলিয়ে টুলিয়ে একাকার হয়ে গেল দীপের।

"ও তুমি কথা বলতে পারো.... আমি ভাবলাম....."

মুচকে হাসল দীপের হলুদ পরী। দেখেছ কী দুষ্টু মেয়েটা।

এতক্ষণ চোখ গোলগোল করে দেখছিল রিয়া

"এতো দেখি কুছ কুছ হোতা হায়.....", রিয়ার কথা শেষ হওয়ার আগেই ওর হাত ধরে ছুট লাগালো সায়ালা সেন,

Presidency Economics, second year. দুই সখীর হাসির আওয়াজ শুনছিল দাঁড়িয়ে দীপ।

দীপের মা আসছিলেন ভোগের বালতির খাঁজে। "কি রে দীপ কোথায় হারিয়ে গেলি থিচুড়ি আনতে গিয়ে?"

"কলকাতায় মা....." বলে বালতি সূদ্ধুই মাকে একপাক ঘুরিয়ে দিল আর বালতি টা মায়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে পালালো।

মা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাবা কে হাসি মুখে এগিয়ে আসতে দেখে বললেন

"কী ব্যাপার বলতো? কী বললো বলতো ছেলেটা? গেলই বা কোথায়?"

"আরে শুনলে না কলকাতায় হারাতে গেল! History repeats

madam. কার ছেলে দেখতে হবে তো। আমিই এখনও হারিয়ে যাই এই কলকাতার মেয়ের মায়ায়, আমার ছেলেটা তো বাচ্চা। "

ঘামতেলে লাল লাল মায়ের ফর্সা গালটা একটু ছুঁয়ে দিয়ে এগোলেন দীপের রাশভারী বাবা।

রাগতে গিয়ে ও হেসে ফেললেন মা।

-----

তারপরের দুদিন কত ফুচকা, বাংলা সিনেমা, ঠাকুর দেখা আর শেষকালে টুক করে ভিক্টোরিয়াও। কলকাতার অলিতে গলিতে কত বিস্ময় জানল Presidency আর AIIMS একসঙ্গে।

পূজো শেষ;

এবার দিল্লী ফেরার পালা। কাল বিসর্জনের পর ফিরে সিঁদুর খেলছিল মায়েরা। মিষ্টি বৌদি মজা করে সিঁদুর লাগিয়ে দিচ্ছিল রিয়া আর সায়াহ্নার গালে। আচ্ছা তখন কী হলুদ পরীর চোখ ছিলছিল করছিল? মনে করার চেষ্টা করছিল দীপ।

বাবা এগিয়ে গেছে একটা ট্রলি নিয়ে। মা পাশে হাঁটছে অন্যমনস্ক হয়ে। প্রতি বারে কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার সময় মায়ের এই কাঁদোকাঁদো মুখটা নিয়ে মজা করে দীপ আর বাবা। এবারে কেন জানিনা দীপের বুকের কাছটা ওটনটন করে উঠল, গলার কাছে একটু বেগা ব্যথা।

"চল বাবু, দেরী হয়ে যাচ্ছে।" মায়ের ডাকে কলকাতার আকাশ থেকে চোখ সরিয়ে পা বাড়াল দীপ।

ঠিক তখনই টুং করে message টা চুকল।

"মন খারাপ করিসনা.....আবার দেখা হবে।"

মা তাকালেন দীপের দিকে। তার কুড়ির ডাকবুকো ছেলেটার চোখটা কী একটু ছিলছিল করছে? যেমন তার নিজের ও করে এত বছর প্রবাসে থাকার পরেও? ও ও কী বুকের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে এক টুকরো কলকাতা?

পিঠে হাত রাখলেন মা দীপের। মায়ে ছেলেতে চোখাচুখি হল একবার। দুজনেই পড়তে পারে দুজনকে। এগোলো ওরা domestic departureর দিকে।

খুব শিগগির আবার আসবে ওরা কলকাতায়, বার বার।

....Vistara UK279 is ready for taxing...We will fly to Delhi soon.....

মা ভাবলেন, যাক ছেলেটা এতদিনে বুঝল আমাদের শিকড়টা কোথায়। ছেলের হাতের উপর হাত রেখে বললেন

"Miss করছিস?"

"I will miss Kolkata ma now and forever,...", বলল দীপ।

প্লেন তখন হাওয়ায় ডানা মেলেছে।



## 'মারী' ও মানুষ

প্রসেনজিৎ সেন, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ২০০৭

মোবাইল টা অনেকক্ষণ ধরে তারস্বরে অ্যালাম বাজিয়ে চলছে। আধোঘুমে যাহোক করে বন্ধ করল সুলদ। অনেক দিন অফিস না গিয়ে সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাসটাই চলে গেছে। ওয়ার্ক ফ্রম হোমে তো আর সুদূর নয়ডা যাবার তাড়া থাকে না। কিন্তু আজ থেকে আবার পুরোনো রুটিনে ফেরা। অফিস খুলেছে কিছু দিন হল। আজ থেকে তাকেও যেতে হবে। একদিকে ভালোই হল - বাথরুমে যেতে যেতে ভাবল সুলদ। একে ২০% বেতন কমিয়ে দিয়েছে। তার পর কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে কিছু লোকের চাকরিও যেতে পারে। অবশ্য সুলদ বরাবরই বস্ এর গুডবুকে থাকার ছেলে। বস্ এর হ্যাঁ তেই হ্যাঁ মেলায়, আর পাঁচ জনের মতো সুযোগ থাকলেও ফাঁকি মারে না আর - ও হ্যাঁ রাতে শোবার আগে অফিস এর ইমেইল এর জবাব দিতে ভোলে না।

এসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই শাওয়ার চালু করল এবং ঠান্ডা জলের তোড়ে চমকে উঠল। মিনু গীজার টা ওন করতে ভুলে গেছে। মনে মনে একটু রাগ হল সুলদ এর। তারপর ভাবল অনেক দিনের অনভ্যাসের ফলেই হয়তো এ ভুল। মিনুর আর চিন্তা কি - বাড়িতে থাকে, অফিসের ঝঙ্কি পোহাতে হয় না। যাইহোক কোনরকমে চান করে বেরোলো সে। এরপর ব্রেকফাস্ট করেই দৌড়োবে অফিসের জন্য। জামাকাপড় সাজিয়ে রেখেছে মিনু। যাক এটা তাও ভোলে নি। রেডি হয়ে ব্রেকফাস্ট এর টেবিলে এসে দ্যাখে তোজোও উঠে চলে এসেছে কখন। তোজো ওদের একমাত্র সন্তান - ৪ বছর হল গত এপ্রিল এ।

"বাপি তুমি অফিস যাচ্ছ?" সুলদকে দেখেই বলে উঠল সে।

"হ্যাঁ বাবু আজ থেকে আবার অফিস তোর বাবার", মিনু বলল।

"কিন্তু বাইরে গেলে তো ভাইরাস কামড়ে দেবে তোমায়" একটু চিন্তাগ্রস্ত যেন তোজো।

"না সোনা, এই দেখ আমি মাস্ক নিয়ে নিয়েছি।"

"আমার জন্য বড় একটা চকলেট আনবে কিন্তু" - তোজো তার ডিম্বান্ড জানিয়ে দিল।

ছেলে কে হামি দিয়ে ব্যাগ, টিফিন, মাস্ক, স্যানিটাইজার নিয়ে হস্তদস্ত হয়ে বেরল সুলদ। গুরুগ্রাম থেকে নয়ডা প্রায় ৪০ কিমি রাস্তা ড্রাইভ করতে হবে। প্রায় তিন মাস পর বেরোচ্ছে সে। জানেও না রাস্তাঘাটের কি অবস্থা। এসব ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ খেয়াল হল মানিব্যাগে একটাও টাকা নেই। এ কমাস তো বেরোনোই হয়নি - সব অনলাইন কেনাকাটা হয়েছে। যাইহোক সোসাইটির বাইরে একটা এটিএম আছে তাই রক্ষা। কিছুক্ষণ হেঁচকি তোলার পর গাড়ি চালু হল।

সোসাইটির গেট দিয়ে বেরোলেই সারি দিয়ে কটা দোকান আছে সেখানেই এটিএম। তড়িঘড়ি গাড়ি পার্কিং এ রেখে গেল সে টাকা তুলতে। সব পাঁচশর নোট। টাকাগুলো ব্যাগে ঢুকিয়েই গাড়ির দিকে রওনা দিল।

"সাবজী, সাবজী" পাশ থেকে কে যেন ডেকে উঠল করুন স্বরে। থমকে দাঁড়ায় সুলদ। ওর থেকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে ডাকছে একটা লোক - সাথে বছর ৩-৪ এর একটি ছেলে। ভাঙ্গা গাল, শীর্ণ শরীর, বহুদিন তেল না পড়া রুক্ষ চুলে ভর্তি মুখ। "বাবুজি কুছ পয়সা দেদো, রোজ কা কাম করতে থে ইধর, আভি লাকডাউন মে সব বন্ধ হো গয়া তো কাম ভী গয়া হামারা। আব না খানে কেলিয়ে পয়সা না রহনে কি ঘর। কুছ মদত করো বাবুজি আপকা প্যার পাকড়তা হু।" - এক নিঃশ্বাসে বলে গেল কথাগুলো। একে অফিসের তাড়া আর কোনো খুচড়া পয়সা নেই।

"মাফ করো" বলে কোনো রকমে গাড়িতে উঠল সুলদ। গাড়ি ছুটল অফিসের দিকে।

অফিস মোটামুটি টাইমেই পৌঁছে গেছে সুহৃদ। ভালোই নিয়মকানুন বেড়েছে অফিসে করোনার চক্ররে। নিজেকে করোনা মুক্ত প্রমাণ করে ডেস্কে এসে পৌঁছল অবশেষে। বেশ ভালো লাগলো সুহৃদের। এবার কটা দিন জান লড়িয়ে কাজ করে তারপর বস্ কে ধরতে হবে স্যালারি রিভিশন এর জন্য। এইসব ভাবতে ভাবতে ল্যাপটপ টা সবে খুলেছে তখনই বস্ ডেকে পাঠালেন।

"May I come in sir" হাসি মুখে কেবিনে ঢুকতে গিয়ে একটু হাঁচট খেল সে। বস্ বসে আছে HR head এর সাথে। কুশল বিনিময়ের পর বস্ শুরু করল আসল কথা।

Look Suhrid, the company is going through an extremely challenging situation. Ours sales down 90% in past 3 months due to covid and we expect it will be even worse in coming days. So, we really don't need such sales force. We can offer you two options, either you go for six months of unpaid leave, or take a voluntary separation with 6 months' salary. You have one day to think."

মাথায় যেন বাজ পড়লো সুহৃদের। এরকম অবস্থা তার কল্পনার ও বাইরে। কোনো রকমে টলতে টলতে বেড়িয়ে এল সে। চোখ বন্ধ করে ডেস্কে বসে রইল অনেক্ষণ। দিয়ে ওয়াশরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে একটু ধাতস্ত হল। ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাড়ির দিকে। যেতে যেতে চোখে পড়ল রাস্তাঘাটে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা উদ্বাস্ত কিছু মানুষজন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে গাড়ি গুলোর দিকে - যদি কেউ কিছু সাহায্য করে। আর সার বেঁধে চলছে একরাশ মানুষ তাদের সংসার নিয়ে। কত হতে পারে এদের সংখ্যাটা? হাজারে, লাখে - নাকি আরও বেশী। সুহৃদ ওদের সঙ্গে নিজের কোন পার্থক্য খুঁজে পেল না।

সোসাইটির গেট দিয়ে ঢুকতে গিয়ে লক্ষ করল সেই লোকটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চাটাকে নিয়ে। রাস্তার পাশে গাড়ি রেখে এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। মানিব্যাগ থেকে টাকা গুলো বার করে গুজে দিল তার হাতে। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গেল লোকটা। তারপর ভেঙে পড়লো কান্নায়। সুহৃদের চোখেও জল। এক মূহুর্তের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল সোশ্যাল ডিস্টেনসিং। এই অপ্রত্যাশিত সময়ে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখাই ভালো, কিন্তু দরকার একে অপরের পাশে দাঁড়ানো, - একথা যেন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল সুহৃদ।



## ভুল সবই ভুল

প্রদীপ্ত দত্ত, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ১৯৭৩

না না গান আমি গাইব না, তবে আমার জীবনের পাতায় পাতায় ভুলের পাহাড় বেকারিং ডেসিমালের মত বেড়েই চলেছে। এই তো সেদিন গাড়ী বার করার আগে যথারিতি শো-কেসের ড্রয়ার খুলে ড্রাইভিং লাইসেন্স বার করতে গেছি। আবাক কাণ্ড বটে, লাইসেন্স নেই। ওদিকে হার হাইনেস রেডি, “কি হল, কি খুঁজচ? চল দেরী হয়ে যাচ্ছে যো” “না মানে লাইসেন্সটা যে কোথায় গেল”, মিউ মিউ করে বলি। কথার দরকার মহিলাদের বেশি হয়না, রোষকশায়িত নেত্রের দৃষ্টি যথেষ্ট। শেষ মেক-আপ দেবার চেষ্টা। যাব তো ৩৪ সেক্টর, কিছু হবেনা। “কিছু হবে কি হবে না জানিনা। কিন্তু কেস যদি খাও, আমি গাড়ী থেকে নেমে অটো ধরে সোজা বাড়ি”, গট গট করে বেরিয়ে লিফটের কাছে চলে গেলেন তিনি। অন্যদিন ফ্ল্যাটের দরজার চাবিটা তিনি দেন। আজ সে গুড়ে বালি। চোরের মত দরজার চাবি বন্ধ করে গুটি গুটি পায়ে লিফটের কাছে গিয়ে বোতাম টিপি। ম্যাডাম লিফটে একা যাওয়ার সাহস দ্যাখান না। ১৬ তলা থেকে বেসমেন্ট কোন কথা নেই। দরজা খুলে সামনের সিটের বাঁ দিকে গম্ভীর মুখে বসে পড়লেন। বেচারা আমি চালকের সিটে বসে দরজা বন্ধ করে চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট দিয়েছি ভয়ে ভয়ে। “গাড়িটার দরজা ডাঙল বলে” – চাপা গলায় দাঁত কিড়মিড়িয়ে উঠলেন। চাপা রাগটা দরজার ওপরে ঝেড়েছি; তারই ফল বোধহয়। যাই হোক বেসমেন্ট থেকে এক নম্বর গेट দিয়ে বেরিয়ে ডানদিকে মুড়ে সোজা চলে SBI থেকে বাঁ দিকে ঘুরে সোজা রাস্তা ধরে কেন্দ্রীয় বিহারের পাশ দিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায়। সামনের ইউ-টার্ন নিয়ে ৩৪ সেক্টরে যাব। খুব সাবধানে যাচ্ছি, হটাৎ ডানদিক দিয়ে এক হতচ্ছাড়া বাইক নিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল। কোনরকমে সামলে নিয়ে ইউ-টার্ন নিয়ে এগুচ্ছি। পাশে আবার দাঁত কিড়মিড়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি কিন্তু তাকাবার সাহস হচ্ছেনা। ‘আমার কি দোষ দিদি’ – আবার কেলো, ভয়ের চোটে বউকে দিদি বলে ফেলাছি। “বুড়ো বয়সে ভীমরতি হল?” – কান ধরার উপায় নেই, স্টিয়ারিং এ হাত। নীরবে গাড়ী মাদার ডেয়ারির সামনে পার্ক করলাম।

বশংবদ ভূত্যের মত ম্যাডামের ব্যাগ ইত্যাদি নিয়ে এ দোকান সে দোকান খানিক ঘুরে তিনি চুকলেন বিউটি পার্লারে। খানিক স্বস্তি, অন্তত ৪০ মিনিট। মাদার ডেয়ারির সামনের চায়ের দোকানে বসে একটা সিগারেটে সুখটান আর সাথে এক ভাঁড় গরম চা। আমার মতন সুখী কে আছে - না কোনো সখীকে কাছে ডাকার সাহস বা ইচ্ছে কোনটাই আর নেই। এক সখীতেই হিমসিম, আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়া।

মুঠো ফোন বেজে উঠল। ডাক এসে গ্যাছে। প্রতীয়মান হোয়েছেন তিনি। আস্তে আস্তে গাড়ীর দিকে এগোচ্ছেন। বলতে নেই চেহারা একটু যেন চেকনাইও এসেছে। চেপে যাও। নো প্রকাশ। মুখ দেখে মনের ভাব বোঝা দায়। একটু ঝুঁকে উত্তম কুমার স্টাইলে সামনে বাঁ দিকের দরজা খুলে দিয়েছি এবং তিনি অধিস্থিত হলেন। দরজা এবার সাবধানে বন্ধ করে চালকের আসনে বসে নরম করে গাড়ী স্টার্ট করেছি। কিঞ্চিৎ নাসিকা কুঞ্জন তারপরই “আবার সিগারেট খেয়েছো?” “না মানে ওই একটু বসে ছিলাম একা কিছুক্ষন, তাই আর কি”, তোতলাতে তোতলাতে বলি। “চুইংগাম ছিলনা দোকানে? এবার থেকে একা লাগলে চুইংগাম চিবাবো। সুকল্লকে দেখে শিখতে পারনা? এক কথায় কিরকম ছেড়ে দিল।” চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ তাই সুকল্লকে মনে মনে গাল দিতে দিতে নীরবে সব বাক্যবাণ হজম করে গাড়ী চালানোতে মন দিলাম। ফেরার পথে মোটামুটি নির্বিঘ্নে পি -১৬০৪ এ প্রত্যাবর্তন।

এবার শুরু গরু খোঁজার পালা। কোথায় গ্যাল ড্রাইভিং লাইসেন্স। শো-কেসের ড্রয়ার থেকে আরম্ভ করে আলমারির সমস্ত তাক সবকিছু ওলট্ পালট্ করেও পাওয়া গেলনা। মাঝে একবার রান্নাঘরের তাকগুলোতে খুঁজতে গিয়ে বেদম ঝাড় খেয়েছি। কে জানে ওখানে তেনার কি মহামূল্যবান মণি মানিক্য আছে।

আসলে পেছনের কাহিনীতে একটু টুইস্ট আছে। মাঝে হঠাৎই একদিন আবিষ্কার করলাম যে লাইসেন্সের মেয়াদ বেশ কয়েকমাস হল অতিবাহিত হয়েছে। দালাল ধরে বেশ কিছু গচ্ছা দিয়ে মাত্র কয়েক মাস আগে নতুন

লাইসেন্স হাতে এসেছে। আসা ইন্তক চিন্তা করে আবার হারাব। ১৭ তলার এক সলদয় ভদ্রলোকের বদান্যতায় ও যতীন্দ্রের সহায়তায় পুরোনোটি একবার উদ্ধার হয়েছিল বেস্টমেন্ট পারকিং থেকে। তার পর এই কাণ্ড। যাই হোক, সারাদিন নানান যায়গায় খুঁজেও পাওয়া গেলনা। হাল যখন প্রায় ছেড়েই দিয়েছি, হঠাৎ মনে পড়ল আমার কাঁধে ঝোলানো ছোট কালো ব্যাগটার কথা। পূজোর সময় নজর করেছেন নিশ্চয়ই সকলে। সন্দীপেরও এইরকম একটা আছে।

ঘরপাী এখন সমব্যাপী। “একবার ওটা খুঁজে দেখ তো, মনে হচ্ছে ওটাতেই রেখেছ।” হায়রে কপাল, তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেলনা। “বেশী ভেবে আর কি করবে? তোমার এই গোছান স্বভাব, কোথায় রাখ ভুলে যাও। বাড়ীতেই আছে, কাল অফিস গেলে আমি একবার ভাল করে খুঁজে দেখব।” রাতে ছেলে বাড়ীতে ফিরে সব শুনে টিপ্পনী কাটলেন, “ওই দালালটার সাথে একটা Quarterly Contract করে নাও। চার মাস অন্তর একটা করে নতুন লাইসেন্স বানানোর।”

টিকা টিপ্পনী সবই হজম করতে হচ্ছে। আসলে ভুলের ইতিহাস লেখা হলে আমি একটা চারিত্রিক উদাহরণ হতে পারতাম। আশ্বাস্যাডার গাড়ী কালীবাড়িতে ফেলে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ী ফিরে আসা থেকে আরম্ভ করে হাতে ইরেজার নিয়ে সারা বাড়ী তোলপাড় করা ইত্যাদি অনেক ঘটনাই আছে।

পরের দিন অফিসে উদগ্রীব হয়ে আছি ফোনের অপেক্ষায়। আসার পথে দালালের সাথে কথাও হয়েছে আবার বানাতে কত খরচ ইত্যাদি হবে। অবশেষে ফোন এল, “না গো কোথাও পেলাম না। কি আর করবে, দালালটাকে দিয়েই আবার একটা করিয়ে নাও।”

বাড়ী ফিরে নতুন লাইসেন্স বানানোর সময় যে অস্থায়ী রসিদ পেয়েছিলাম এখন সেটিই ভরসা যতদিন না নতুন বানানো হচ্ছে। গাড়ী নিয়ে প্রয়োজনে বেরোচ্ছি বটে কিন্তু শঙ্কিতপ্রাণে। এইভাবেই চলছিল; কিন্তু হটাৎ করে একদিন ঘটল এক দৈবিক ঘটনা। ছুটির দিনে আনমনে এদিক সেদিক ঘরের ভেতর ঘুরছি, হঠাৎ মনে হল আলমারিটা একটু গোছানো যাক। আলমারি খুলেই ডান দিকের পাল্লায় হুকে ঝোলানো সেই কালো ব্যাগ। কি মনে হল ব্যাগ নামিয়ে একবার চেন দেওয়া ভেতরের পকেটে হাত দিতেই – পরম মানিক আমার সাতরাজার ধন দিব্য অবস্থান করছেন। অথচ কতবার আমি ও আমার তিনি ওটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি তার ইয়ত্তা নেই। “ওগো শুনছ, পেয়েছি, ব্যাগের ভেতরেই ছিল, অবাক কাণ্ড”, গলায় আমার আরকিমিডিসের “ইউরেকার” মত আনন্দের সুর। “জয় বাবা লোকনাথ, জয় বাবা হারা কার্তিক”, আমার দেব-দেবী ভক্ত তিনি পরম শ্রদ্ধায় কপালে হাত ছোঁয়ালেন।

এবার থেকে উনি ব্যাগের ভেতরই থাকেন। আমার মতন এই দায়িত্ব জ্ঞানহীন অকালকুস্মাণ্ড, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো আহাম্মকটিকে এতকাল যিনি আপদে বিপদে আগলে রেখেছেন, এখন তাঁর জিন্মায় ব্যাগ গচ্ছিৎ। গাড়ী নিয়ে বেরানোর সময় সব গুছিয়ে এগিয়ে দেন।

কাকা যাই বল আর তাই বল যেমন কানু ছাড়া গীত নেই তেমনি বিবাহিত পুরুষদের বউ ছাড়া স্থিতি নেই।

## বাংলা নাটক- আড়াইশো বছর

নীলাদ্রি দ্যুরী, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ১৯৭২

নৃৎ প্রাতু হতে নাটক কথাটার সৃষ্টি, নৃত্য থেকে ভারতের নাটকের জন্ম।

বৈদিক যুগ থেকে রামায়ণ এবং মহাভারত মহাকাব্যের অনেক জায়গায় নাটকের উল্লেখ আছে।

সংস্কৃত নাটক 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূতম', 'অভিজ্ঞানম শকুন্তলম'।

মুসলমান শাসনকালে নাটক প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় একহাজার বছর বিশেষ কোনো নাটক তৈরী হয়নি।

সংস্কৃত নাটক ছিল মিলনান্তক, কিন্তু গ্রীক নাটক মিলনান্তক ও বিয়োগান্তক।

দেবতার নামে গান গেয়ে বা অভিনয় করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া বা যাত্রা করা থেকেই 'যাত্রা' অভিনয়ের শুরু হয়।

মহান নাট্যকার শেক্সপীয়ার ও অন্যান্য বিদেশী নাট্যকারের নাটক অনুবাদ করে শুরু হয় বাংলা নাটক সতেরোশো সালের শেষাংশে।

বাংলা নাটকের জন্য নাট্যশালা 'বেঙ্গলি-থিয়েটার' কোলকাতায় তৈরী করেন রুশদেশবাসী বিদেশী হিরোসিম লেবেদবা। 'DISGUISE', 'LOVE IS THE BEST DOCTOR' বাংলায় অনুবাদ করেন হিরোসিম লেবেদবের ভাষা শিক্ষক গোলক নাথ দাস। ১৭৯৫ সালের ২৭ শে নভেম্বর DISGUISE এর বাংলা অনুবাদ 'ছদ্মবেশী' নাটক অভিনীত হয় বেঙ্গলি থিয়েটার হলে।

শেক্সপীয়ারের বেশ কয়েকটি নাটক বাংলাতে অনুবাদ হয়। 'THE MERCHANT OF VENICE' থেকে হয় 'ভানুমতীর চিত্তবিলাস', 'ROMEO AND JULIET' থেকে হয় 'চাক্ষুঃ চিত্তহার' 'COMEDY OF ERRORS' অবলম্বনে 'ভ্রান্তিবিলাস', 'MACBETH' থেকে হয় 'রুদ্রাপাল', 'TEMPEST' থেকে হয় 'নলিনী বসন্ত'। বাংলা নাটকে শেক্সপীয়ারের প্রভাব প্রবল।

সংস্কৃত নাটকের প্রভাব বাংলা নাটকে পড়েছে। হরচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রামনারায়ণ বেশ কিছু অনুবাদ নাটকের সূচনা করেন। ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটক থেকেই অনুবাদ নাটক শুরু হয়। রামনারায়ণ তর্করত্ন বেশ কিছু অনুবাদ নাটক লিখেছেন বটে তবে তার 'কুলীনকুলসর্বস্ব', মৌলিক সামাজিক নাটক। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' কে বাংলা সাহিত্যের আদি নাটক বলা হয়। নাটকটি লেখা হয় ১৮৫৪ সালে। এই নাটকে কৌলিন্য প্রথার দোষ হাস্যরসের মাধ্যমে নিন্দা করা হয়েছে। মেঘনাথ বধ কাব্যের রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত কয়েকটি নাটক ও প্রহসন লেখেন। তার মতে 'অলীক কুনাট্য রঙে মজে লোক রাড়ে বঙ্গে, নিরাখিয়া প্রাণে নাহি সয়'।

সত্যিই তখন বাংলায় ভালো নাটক ছিল না। 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'মায়াকানন' নাটকগুলি লেখেন মধুসূদন দত্ত। তার দুটি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো'। 'একেই কি বলে সভ্যতা'তে মাইকেল তখনকার ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মদ খাওয়া, কিছুই না মানা, চরিত্রহীনতা, অশ্লীল কথাবার্তা বলা, ব্যভিচারী জীবন যাপনের প্রতি কটাক্ষ করে লিখেছেন। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো'তে নাট্যকারের লক্ষ্য বঙ্গের দুষ্কৃতিকারী, অত্যাচারী প্রাচীন সমাজ, বাইরে মালাজপা, কীর্তন, কিন্তু গোপনে পরের সম্পত্তি দখল, সামাজিক প্রতিপত্তির জন্য দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, কিন্তু গোপনে মেয়ে মানুষ পোষা অনেকের নিত্যব্রত ছিল।

ইংরেজ ব্যবসায়ীরা নীল চাষ শুরু করে। দেশের চাষী রাইয়তদের দুর্দশা শুরু হয়।

কারণ জাল, জুয়াচুরি, প্রতারণা, উৎপীড়ণ, যেমন করে হয় ইংরেজরা চুক্তির দায় চাষীদের উপর চাপিয়ে দিত।

যে সব চাষী রাইয়ত চাষ করতে অসম্মত হতো গুলি করে বা বর্ষা গোঁথে তাদের হত্যা করা হতো; গুদাম ঘরে আটকে রেখে চাবুক লাগানো হতো। মেয়েদের ইজ্জত লুট হতো। এর প্রতিবাদ করে দীনবন্ধু মিত্র লিখেছিলেন 'নীলদর্পণ'।

এছাড়া দীনবন্ধু মিত্র বেশ কয়েকটি প্রহসন ও নাটক লেখেন। বাংলা নাটক ধীরে ধীরে উন্নতমানের হতে থাকে। শুরু হয় পৌরাণিক, সামাজিক, ছন্দনাট্য, গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা জ্যোতিষ্মনাথ ঠাকুর বেশ কয়েকটি নাটক লেখেন।

'পুরু বিক্রম', 'সরোজিনী', 'স্বপ্নময়ী', 'এমন কর্ম আর করব না' বা 'অলীকবাবু'।

'অলীকবাবু' প্রহসনে মূর্খ অলীকের মিথ্যা কথা বলা আর নোভেলী নায়িকা হেমাজিনীর রোমান্স প্রিয়তা নাট্যকার খুবই সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

গিরিশ ঘোষ বাংলা নাটকে একজন প্রতিভাধর নাট্যকার, রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও অভিনেতা। অনেক ভক্তিমূলক নাটক, পৌরাণিক নাটক ও ঐতিহাসিক নাটক তিনি লিখেছেন ও সফলভাবে পরিচালনা করেছেন। স্বয়ং শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের ভক্তি ও পৌরাণিক নাটক দেখতে দক্ষিণেশ্বর থেকে আসতেন। গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাঁর গৌরীশী ছন্দ। এই ছন্দ আজকের অনেক নাট্যকার অবলম্বন করে থাকেন।

তাঁর লেখা নাটক 'রাবণবধ', 'সীতার বনবাস', 'লক্ষ্মণ বর্জন', 'চেতন্য লীলা', 'বিষ্ময়ঙ্গল', 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'ভ্রান্তি' ইত্যাদি। 'প্রফুল্ল', প্রথম সফল বাংলা সামাজিক নাটক। গিরিশচন্দ্রের সময়ের এক অভিনেত্রীর নাম অবশ্যই

উল্লেখ করা প্রয়োজন। নাম ছিল তার বিনোদ বাল্য। এসেছিলো পতিতালয় থেকে। কিন্তু এই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীর নাম পরে হয়েছিল 'নটী বিনোদিনী'। এই মহীয়সী রমণীর ত্যাগে গড়ে ওঠে স্টার থিয়েটার।

রসরাজ অমৃত লাল বসু ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যকার। সফল ব্যঙ্গনাটক বা SATIRE PLAY এর রচয়িতা হলেন অমৃতলাল বসু। 'বিবাহ বিভ্রাট', 'চাটুয্যে ও বাড়ুয্যে', 'ব্যাপিকা বিদায়'। 'ব্যাপিকা বিদায়' নাটকে মিসেস পাকড়াশীর মত দজ্জাল শাস্ত্রী কি করে মেয়ে ও জামাইয়ের সংসারে অশান্তি ঘটায় তাই সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্র লাল রায় বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক লেখেন। 'সাহাজান' দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শ্রেষ্ঠ নাটক। আর একটি নাটক এখনো সকলকে নাড়া দেয়, তা হলো 'চন্দ্রগুপ্ত'।

বহুমুখী প্রতিভাশালী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার নাটক গুলি কাব্যধর্মী। তিনি অনেক গীতিনাটক, কাব্যনাটকও লিখেছেন। 'ডাকঘর', 'চিরকুমার সভা', 'মুক্তধারা', 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'রুদ্রচন্দ্র', 'প্রকৃতির পরিশোধ', 'শ্যামা', 'রক্তকরবী', 'চিত্রাঙ্গদা', 'রাজা ও রানী', 'তাসের দেশ' ও বেশ কিছু হাস্যকৌতুক বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র পরবর্তী নাট্যকারেরা হলেন মন্মথ রায়, শচীন্দ্র সেনগুপ্ত, মহেন্দ্র গুপ্ত, নিশিকান্ত বাসু রায়, তারশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে নবনাট্য আন্দোলন শুরু হয়। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' দিয়ে শুরু। যুদ্ধের পর ভারত স্বাধীনতা পেল। কিন্তু সমাজে নানারকম সমস্যা রয়ে গেল।

সাম্প্রদায়িক বিরোধ, উদ্বাস্ত সমস্যা, বেকারী, দারিদ্র, সমাজকে ও শাসন ব্যবস্থাকে পঙ্কু করেছিল। এরই পটভূমিকায় বিধায়ক ভট্টাচার্যের নাটক 'ক্ষুধা'।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা বেশ কটি নাটক খুব জনপ্রিয় হয়। কিরণ মিত্র, ছবি বন্দোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় বৈরাগীর বেশ কয়েকটি নাটক বাংলা নাট্য সাহিত্যে জায়গা করে নিয়েছে।

বাদল সরকার বাংলা নাট্য জগতের একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাম। হাসির নাটক, আবসার্ড বা উদ্ভট নাটক 'স্পাটাকাস' ও 'খড়ির গন্ডি' বিখ্যাত নাট্যবিদ ব্রেস্টের নাট্য দর্শনের প্রভাবে লেখা।

মোহিতলাল চট্টোপাধ্যায়কে বলা হয় আবসার্ড বা উদ্ভট নাটকের সফল নাট্যকার। মনোজ মিত্র বাংলা নাটকের একজন কৃতী ও ব্রতী নাট্যকার। অনেক SATIRE নাটক তিনি লিখেছেন, অভিনয় ও পরিচালনা করেছেন। বাংলার নাট্যাভিনয়, নাট্যরচনা, নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে উৎপল দত্তের নাম প্রথম শ্রেণীতে। বাস্তবতা, চরিত্রের রূঢ় ও রুক্ষ অঙ্কনে, দ্ব্যঙ্গিক বস্তুবাদে উৎপল দত্তের নাটক বাংলা নাটকের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। অনেক নাট্য সংস্থা বহুনাটক সফল পরিচালনা ও অভিনয় করেছেন।

বহুরূপীর শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, কুমার রায়, রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', 'ডাকঘর', 'বিষর্জন' সফল মঞ্চস্থ করেন। এছাড়া সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ট্রাজেডি গ্রীক নাটক রাজা অয়দিবাইস শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রের অভিনয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

ব্রেস্টীয় রীতির প্রয়োগে নাটক মঞ্চস্থ করায় নান্দীকারের নাম উল্লেখযোগ্য। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়ের সফল পরিচালনায় বেশ কয়েকটি নাটক দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রাশিয়ান নাট্যকার চেখভের নাটক বাংলাতে রূপান্তর করে সার্থক পরিবেশনা করেছে নান্দীকার গোস্বামী।

অরুণ মুখোপাধ্যায় রচিত, চেতনা পরিচালিত 'মারীচ সংবাদ' ব্রেস্টীয় নীতির সফল প্রয়াস।

বাংলায় ছোটোদের নাটক লিখেছেন সুকুমার রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, মনোজ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আমিতাভ চৌধুরী। শৈলেশ গুহনিয়োগী বেশ কিছু হালকা ও হাসির নাটক লিখেছেন। যারা প্রথম নাটক করা শুরু করে তারা এই নাটক গুলি দিয়েই হাতে খড়ি নেয়।

যাত্রা বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে একটা জনপ্রিয় লোকনাট্য ধারা। এগুলো চার ঘন্টা ব্যাপী বিপুল আয়োজনের বিনোদন।

উঁচু গলায়, চড়া আলোকে বিরাট চারিদিক খোলা মঞ্চে অভিনীত হয়। অতিনাটকীয় ভাবভঙ্গি ও আবৃত্তির মাধ্যমে প্রায়ই যাত্রার উপস্থাপনা করা হয়ে থাকে।

ঋতি নাটক শব্দটা শুনলেই মনে হয় কিছু শোনার ব্যাপার। যখন শুধু বেতার বাণীর যুগ ছিল, দূরদর্শন চালু হয়নি তখন ঋতিনাটক বেতারে ভেসে আসত। যাদের পক্ষে থিয়েটার হলে যাওয়া সম্ভব হতো না তারা বেতারে ঋতি নাটক শুনতো। যদিও আজ দূরদর্শনে অনেক নাটক ও বিবিধ বিষয়ে অনেক কিছু দেখানো হচ্ছে। ঋতি নাটক শেষ হয়নি, বরং আরো জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। ঋতি নাটক সম্বন্ধে বলতে গেলে জগন্নাথ বসু ও উর্মিমলা বসুর নাম অবশ্যই বলতে হয়, যাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আজ এই শিল্পটি অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

## রাঁধার পর খাওয়া, আর খাওয়ার পর রাঁধা

বিনীতা রায়, ইংলিশ, ২০০৭

বিয়ের পর বরকে প্রথম রান্না করে খাইয়েছিলাম লুচি আর সাদা আলুর তরকারি। লুচিগুলো ভালোই হয়েছিল, কিন্তু আলুতে এতো বেশি নুন দিয়ে ফেলেছিলাম যে লুচির স্বাদটা বিশেষ উপভোগ করতে পারেনি সদ্য বিবাহিত বর। এর পর চেষ্টা করি বিদেশী খাবার বানানো। ভালো করে নানা রকম exotic উপাদান দিয়ে ওভেনে চাপিয়ে দি মুরগি; রোস্ট চিকেন বানাবো বলে। তার আগের দিনই অবশ্য ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম রেসিপি অনুযায়ী। সেখানে বলা ছিল লেবুর রস আর লেবুর খোসা, দুটোই ব্যবহার করতে হবে। এ অবশ্য বিদেশী লেবু। সে আর আমি দিল্লির বাজারে খুঁজে পাইনি। পাতি লেবুতে আমার অগাধ আস্বাদ, তাতেই হবে। যখন চিকেন ওভেন থেকে বেরোলো তখন তার থেকে সুগন্ধ ভুরভুর করছে। হবেই তো, প্রচুর মাখন ব্যবহার করেছি। সে সহোৎসাহে খেতে বসলাম আমরা-সেদিন আবার আমার এক দেওর অতিথি। এক গ্রাস খেয়েই বোঝা গেলো যে পাতি লেবু যথায়ত ভাবে কাজ করেছে। লেবুর খোসার দৌলতে রোস্ট চিকেন হয় উঠেছে bitter butter roast chicken। নামখানা বর খুব ভালোবেসে দিয়েছিলো বৌয়ের বানানো ততো মুরগির রোস্টকো।

রান্নায় ফেল হওয়ার আরো গল্প আছে। কিন্তু রন্ধন শিল্পে পটিয়সী না হওয়ার জন্য আমি নিজেকে অবশ্যই দায়ী করি না। এর পুরো দায়িত্বই আমার মা ও বাবার। যতদিন স্কুলে কলেজে পড়েছি ততদিন তারা পড়াশোনা ছাড়া আর কিছুই করতে দেননি। তারপর চাকরি পেয়েই জগতমারিতং। রান্না কখন শিখবো? চাকরি করেই আমি কাহিল। রান্নার দরকার এবং শখ দুটোরই উৎপত্তি হয় বিয়ের পর। কিন্তু আমি রান্না করা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত ছিলাম না। মাকে রান্না করতে দেখেছি সবসময়। টিভিতে রান্নার প্রোগ্রাম কিছু কম দেখিনি--দেশী বিদেশী দুইই। তাই থিওরিতে আমি রান্নায় চ্যাম্পিয়ন। রান্না করা কোনো বড় ব্যাপার হতেই পারে না। নোনতা সাদা আলুর তরকারি আর bitter butter roast chicken এই অগাধ আত্মবিশ্বাসের ফল।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি জীবনের প্রথম ২৮ বছর রান্না শিখিনি কারণ আমার মা রান্নাঘরের ওপর একচেটিয়া আধিপত্য খাটান। এটা শুনে মনে হতেই পারে যে আমি মার নামে মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছি। কিন্তু পরের ঘটনাটা পড়ে নিজেই বিচার করুন। একবার মা একটা তরকারি হালকা নাড়াচাড়া করতে বলেছিলেন যাতে পুড়ে না যায়--মার বোধহয় অন্যদিকে কাজ ছিল। দিব্যি তরকারি সামলাচ্ছিলাম। মা এসে বাহবা দেবে মনে মনে এই আশা। কিন্তু সে গুড়ে বালি। মা ফিরে এসেই বললো, 'ও মা! খুস্তি clockwise নাড়'ছিস কেন? anti-clockwise নাড়বি তো! এইটুকু রান্নাও শিখতে পারলো না মেয়েটা।' এই অপবাদের পর আর মায়ের সাথে রান্না করতে যাইনি। আসলে আত্মসম্মান বোধটা আমার একটু বেশি তো। তাছাড়া রান্না না শেখার আরেকটা বড় কারণ আছে। সেটাও আমার মায়ের সঙ্গে যুক্ত। জ্ঞান হয়ে থাকতে দেখেছি মা একা হাতে সকলের জন্য রান্না করেন। গরমে, ঘেমে, শরীর খারাপ নিয়ে-- মার রান্নায় কোনো ছুটি নেই। মা রান্না না করলে খাওয়া জুটবে না। আর মা রান্না করতে খুব একটা পছন্দও করতেন না। কাউকে ৩৬৫ দিন রান্না করতে হলে সেটা আর পছন্দের থাকার কথাও নয়। অথচ তিনি housewife, কাজেই তার যথায়ত স্থান রান্নাঘরেই--এই ধরণের একটা মনোভাবনাও কাজ করতো বোধহয় মায়ের মনে। সেই জন্যেই হয়তো কিছু বছর আগে পর্যন্তও রান্নার লোক রাখার কথা হলে মা কিছুতেই রাজি হতেন না। বড় হওয়ার সময়, এই কারণেই হোক বা অন্য কোনো ভাবেই হোক, আমার মাথায় এটা চুকে গিয়েছিলো যে যেই মহিলাদের বাইরের জগতে বেরিয়ে চাকরি করার সুযোগ হয় না, কেবল তাদের কপালেই হৈশেল ঠেলার দুর্ভাগ্য জোটে। এবং রোজগার করে 'নিজের পায়ে দাঁড়ানো' অবশ্যই রান্নায় পটিয়সী হওয়ার তুলনায় বেশি বাঞ্ছনীয়। এই চিন্তাধারা যে কতটা অমূলক, ভিত্তিহীন এবং মহিলাদের প্রতি অপমানজনক সেটা বুঝতে আমার বেশ কিছু বছর লেগেছে।

আর পাঁচটা শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের মতো আমাদের পরিবারেও সাফল্য কথাটার মানে ছিল পড়াশোনায় কৃতিত্ব অর্জন করা, তারপর ভালো মাইনের চাকরি করা। জীবনের বাকি প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো, যেমন নিজের কাজ নিজে করা, স্বাবলম্বী হওয়া--যার মধ্যে রান্না শেখাটাও পড়ে-- এইসবে সাফল্য অর্জন করার জন্য কেউ কখনো চাপ দেয়নি। হয়তো আমার মা বাবার মতো অন্যান্য অভিভাবকেরা ভাবেন যে আর্থিক স্বাবলম্বিতা এই সবকিছুর থেকে বেশি প্রয়োজনীয়। তাই তেল নুনের আন্দাজ যে প্রথম কয়েকবার ভুল হবে, সে আর এমন কি আশ্চর্যের ব্যাপার।

আমি এখনো খুব বেশি রান্না করি না। আমার বর খাওয়া নিয়ে কোনো দাবীই দেয় না। যা থাকে হাসি মুখে খেয়ে নেয়। নিয়মিত এক টিফিন সার্ভিস থেকে আমরা খাবার আনাই। বাড়িতে রান্না হয় নেহাতই সাথে অথবা প্রচণ্ড দরকারে। আর সখের রান্নায় বানানো হয় দেশী বিদেশী সৌখিন খাবার। সেই জন্যই হয়তো আমার রান্নায় আগ্রহ এখনো বাকি আছে। বাড়িতে অতিথি সমাগম হলে এখন আমি এক হাতে 4 course meal রঁধে ফেলতে পারি। Bitter butter roast chicken আর নোনতা আলুর তরকারির দিন এখন দূর অস্ত।



# Important Life Lessons Learnt in a Mountain Trekking to Dzongri Top

*Pranab Thakur, Mechanical Engineering, 1985*

Around 39 years ago just after joining Jadavpur University as a student, I immediately got enrolled in our Mountaineering Club. I could not go to any of the trekking sessions organized by the club mostly due to my ill health and subsequently my parents' reservations. I was quite happy to watch videos of trekkers and never ventured out for mountain trekking as my strong inner feeling was that I am not strong enough to complete a long trek. My unmet passion remained inside my mind for years.

Around 2 years back a plan for going for a trek came to my mind when I saw one of my school mate Sumit making trips to Himalayas, posting a few spectacular pictures in Facebook.

"Is it possible for me also to make a trekking trip?" I asked myself. I was waiting for an opportunity. It came quite soon when few of our school friends who used to go to regular trekking decided to go for an Everest Base Camp (EBC) trek. We had one year to prepare. I made up my mind; I started practicing brisk walking every morning to improve my fitness. After a month or so I hurt my leg and could not exercise for the next three months. Few more months' elapsed and around May 2019, news poured in that there were casualties in the Everest Summit route and the base camp had become too crowded. The program for going to EBC was dropped. Surprisingly, two of my JU Mechanical friends Abhi and Sid, who were occasional trekkers, decided to go for a road trip from Kolkata -Siliguri - Yuksom in Sikkim and then a 5 day trek to Dzongri top at an altitude of 4200m. Since it was my first trek, I was doubtful but my friends assured me that it would be an easy trek and would not be a problem for first time trekkers. I started my exercise routine seriously - I had only 3 months left for preparation.

**Life lesson 1 learnt: Build up the passion and start preparation – nothing can be achieved in life without preparation**

Many friends and some family members discouraged me not to take the first trek at this age. I explained them that this is an easy trek and I would come back if I feel unwell. What was important at this stage was not to distract from the goal I had to achieve. Finally, I had support of my wife. I said to myself "Enough reminiscing the past –let's do actual action". I sincerely believed "If you want, nothing is impossible".

Just as the D-day was reckoning, I started surfing the net and found out that this trek is Moderate in Difficulty, i.e. 7 out of 10, and is not advisable for first time trekkers. But my passion had already flared up, so I maintained my positive spirit. My preparation was lagging which was at times worrying me.

**Life lesson 2 learnt: Never lose focus – negatives need to be discarded from life**

We started our road journey on Vijaya Dashami, after arranging for essential items like trekking bags, tents, personal things, contacting the trekking company etc. My friends did the logistics' arrangement without me bothering about it. Travel from Kolkata to Siliguri by car was full of fun like listening to good music, beautiful scenery and sharing sumptuous food. We stayed a night at Raiganj and reached Siliguri next day. Having parked the car at Siliguri, we hired an Innova car next day for travelling to Yuksom which was around 6-hours journey, expecting to reach around 4 pm. We faced our first obstacle when a large landslide blocked our road and certainly there was no hope of getting it cleared that evening, that too in the midst of a constant drizzle. We took a detour and decided to go through Pelling. It was around 5 pm and we needed 2 more hours to reach Yoksum. On that route unfortunately we found another smaller landslide obstructing the passage and could not be crossed by a 4-wheeler.

I closed my eyes and asked myself, "Can we really reach Yuksom? Can we start our trip tomorrow?" I was not mentally prepared to face such a landslide problem –that too in the month of October. It was another 10 km to go which we decided to walk in a rainy and dark evening.

“Do we know the route? “Will it be safe?” ...all sorts of questions came to my mind.

We crossed the landslide by walking over it precariously – luckily it was doable with our backpack.

We had barely crossed the landslide, heavy rains started pouring in. When we were about to turn around, we found a house nearby, latched from outside. We took refuge there thinking we could start walking only when rain stops. Meantime we managed to contact our Yoksum tour guide to arrange a car that came after two hours. We never panicked and were prepared for any eventuality.

**Life lesson 3 learnt: Expect the unforeseen – don’t panic – strategically evaluate all alternatives and complete the task**

That night I felt my pulse racing – my other friends had mountaineering experience which I didn’t have. The fear of climbing a steep mountain in this weather overwhelmed me. I was too tired to think about it and fell asleep. Next day we started our trek early morning and the weather was sunny and bright. The first stop was Sachen for lunch; then night halt was at Tshoka – a distance of 16 km, from height of 1900 m. to 3200 m.

After completing formalities at the Yoksom outpost we followed the trail, which our guide showed us. I was slow, and the first reaction of my friends who had to wait for me, finally told me, “You should not have come – you’re already out of breath.” I told them, “You move along, I will reach in my pace.” I realized that there is no competition and I don’t have to prove anyone and that’s the best way to focus on my abilities. Once I had embarked on this journey, I had to complete it even if I had to do so in small steps. My immediate concern was my next step. Though slow, I did it with great determination and enthusiasm.

**Life lesson 4 learnt: Once you have taken a task – don’t relinquish – take one step at a time**

Mountain trekking is an individual activity but what’s important is that we have to take help of others like guide, pony driver, cook and other teammates in our journey. Only together we could achieve our goal and were all committed to finish the trek together ...if one fails the whole team fails.

The last 2 km of our trek to Tshoka was the steepest. On our way we met trekkers, but majority of them were breaking the journey at midpoint. My friend Sid started feeling uneasy when 6 km was still left. He started telling me that you people should carry on and he would be staying back in a resting place called Bakhim. I did not reply and kept quiet. He was struggling to move forward. We reached the resting place in the evening around 5 pm when dark clouds were about to engulf

the place. Night trekking can never be an option when you have to climb a steep mountain. The Sherpas who were carrying out bags and food had already reached Tshoka. They could not be called back and the resting place was already full. The weather turned cloudy with impending rains. All three of us decided that if we stayed back, we would do it together. The guide was not happy and he understood that nothing would be available there in a rainy day. Ahbi said, “let’s wound up the trek and go back tomorrow”. I was very cal m. We took tea and then finally Sid said, “Let me take rest for a hour and if I feel better I can go”

By this time the rain was continuous and it was complete dark and we could only hear the sound of raindrops. With headlamps on we were about to climb the steepest part of the trail. Fear descended on me momentarily but somehow, I managed to remain composed. I knew that one wrong step or one slip could throw me down by 100 ft. I firmly believed that once we go inside the tent and get some hot food, we would be fine for the next day’s trek. Our guide ensured that I was left not behind in the dark.

**Life lesson 5 learnt: Never forget the team - moving together as a team gives mental strength, alternate solutions, motivation and is a great stress buster**

We took one-day rest at Tshoka and moved the very next day to the Dzongri– a steep climb of around 4 km preceded with a moderate climb of 5 km.

On 4th day around 3 am in the morning, we started to climb the steep Dongri Top – a 3 km steep hike and reached there just before the sunrise.

The majestic Kanchenjunga, along with 13 other peaks of the Himalayas was in front of us like a large canvas. We forgot the hardship and thanked the mountain that it helped us to reach there.

Back to Dzongri for a hearty breakfast and then reached Tshoka the same day. We stayed another night at Tshoka. On the 5th Day we started journey downwards to Yoksum. Being a novice, I thought going down would be easy and that prompted me to move fast, but alas – it was a mistake. The last one-hour journey from Tshoka to Yoksum was fraught with leg pain and I had to limp. We reached Siliguri the very next day with beautiful memories and finally returned to Kolkata.

I myself cannot believe at times that I did it! And that's the point - we often underrate our potential and overestimate our difficulties.

Believe in yourself – “if others can do, so can I”

**Life lesson 6 learnt: Never celebrate early – sometimes the last leg can be most difficult. You can never be arrogant. Learning from mistakes is nothing wrong – do not be ashamed of – it can always motivate you to do better in future.**

All these lessons were experiential in nature and would remain ingrained in me. Life teachings have profound effect on us and our foundation built onto them are ready be used anywhere in the corporate or other spheres of life. At last and not the least let me bow down to the mountains humbly for allowing me to climb the mountain and enjoy its beauty.



# Myth and reality of an ICU – an intensive experience

*Dr. (Mrs.) Leelavati Thakur\**

Intensive Care - a whole basket full of mysteries and myths... not over-expressing, I feel all will be agreeing with me. The common belief about Intensive Care Unit (ICU) hover around very flimsy knowledge and gory pictures painted in every media.

If anyone had visited Hollywood Universal Studio in USA where fun is all around and you find that everyone is enjoying the shows, the rides, etc., there is only one horror flick people are experiencing (rather enjoying) is all about ICU – with dark alleys, broken beds, deadly doctors, nurses and the dead men's spirits catching hold of everyone. Being an ICU doctor, it is very disappointing to see such dangerous depiction of Intensive Care to the society, which itself become a mental barrier to every human being. Here I am trying to enlighten somewhat about ICU.

## **Intensive Care - great fear factor**

Having seen loved ones admitted in any ICU is generally conceived as a very frightening event. These preconceived ideas are actually result of lack of knowledge about it. People who get admitted to ICU are in very critical condition and get maximum care and intensive management of their condition as they need a minute-to-minute monitoring. The wires the tubes and machines around them are giving status information continuously to their caregivers, who are the most caring humans around. They take account of all the changing physiological characteristics of individual patient's ailments and moreover, their constant dedication toward the patient's cause makes them dear to the patient's self.

## **My loved ones...decision theirs!!**

The critical decisions of a critically ill patient always need your participation in his management as a team. The relation is more like a wheel and its spokes, patient being in the centre and the managing team partners including nurses, doctors and obviously you as an important partner of the decision-making team. So, the decision is made together. The critical management involves a lot of scientific calculation tailored to the need of individual patient, which requires a lot of knowledge perseverance, passion, precision and concentration of caregivers.

## **ICU - a painful story**

Not necessarily only the science, critical care revolves around a lot of art. All procedures - invasive, non-invasive are always made painless by anesthesia, sedation and pain relievers. The outcome is obvious – most if not all, the patients cannot recall their ventilation experiences. The smoothness of present day pain relievers leave little physiological effect.

## **Those Disturbing Sounds**

The equipment like ventilators, monitors, infusion and syringe pumps, defibrillators, temporary pulse generators are powered with alarms so that any deviation in any physiology will alert the caregivers about impending problem that should be immediately attended to.

## **Lights...Camera...Action**

Many people who are discharged from ICU to wards may have a complaint regarding the lights all around the ICU all the time. This is a reality that ICU environment is very busy most of the time, due to some or the other procedure, resuscitative team efforts, pulling the crash cart for a collapsed patient, and CPR. These are for nothing but saving a life.

## **Patient put on ventilator... means the end has come?**

Again, a very common misbelief is that initiating the invasive mechanical ventilation implies the end is very near. In most cases the reverse is true. Ventilation is nothing but a respiratory support, which eases and helps a

person to recover from a major multiorgan failure. It is almost same as a sound sleep to rejuvenate and detoxify us after a hectic day.

### **Is that a dead man on ventilator?**

In this regard, I should share one of my own experiences. Once a middle-aged patient came from a nearby village, who used to smoke at least 30 bidis daily. He had his carbon-dioxide levels going dangerously high and had to be invasively ventilated as he was gradually becoming unconscious. His kin thought that he has died, as he was drowsy, fatigued and dependent on ventilator. The village clergy came and started his religious rituals on the bedside and spread the death news from their religious place. Then the ICU staffs chipped in. When he improved substantially and got a new lease of life, the relatives were spellbound.

### **They are making money by keeping the patient on life support - I know my patient is no more**

This is a very jeopardizing belief – doctors keeping the dead body on ventilator. In reality, this is not so. It takes whole lot of efforts to resuscitate and recover a patient after a cardiac arrest. By textbook recommendation post resuscitation, 72 hours is the minimum time to wait to prognosticate recovery. Legally speaking, we are not permitted to take off one's life support until he is clinically and electrocardiographically dead. And for the brainstem dead patient, the verdict had come from Supreme Court in 2013 regarding formulation of protocol of withdrawal which is yet to see the light of the day.

### **My patient came walking and worsened greatly in the hospital**

Every disease has its unique evolution curve. Whosoever comes in the evolving phase may get further deteriorated. Patient's outcome depends upon multiple factors like age, metabolic and nutritional state, race, treatment initiation and functional status of the organs. So, despite maximum and aggressive management there may not be a satisfying outcome many times.

### **Lots of expenses... getting bankrupt**

Not an iota of doubt here. Intensive treatment requires help of a lot of expensive gadgets, medications, investigations and all these definitely come with a cost. Along with that the constant deployment of bedside nurses and doctors too add to the expenditure. Similarly, the requirement of consumables is more in ICU and hence the bills also go northwards.

### **The doctors are butchers...taken all our money...thrash them!**

Again, a very common misbelief. The doctors are neither god nor butcher. They are human beings like all others. They get hardly 4-10% of total billed amount from hospital. From that they need to raise their families, educate their children like any common man.

And being a human, they try to save life of every human passionately enough with their hardearned knowledge after studying for years. My own experience of 27 odd years in critical care is a story of passion for this field where I could connect to a lot of good human beings. This is what an ICU is all about. We have a father, a mother, a sister or a brother in each patient coming in and everyone is very special to us. This human touch will be taking this stream forward forever. We are the happiest on earth if we can discharge them with their health back to normalcy and our patients too are overjoyed to see their caregivers later. That makes our day; their joys are our incentives.

**\* *Wife of Pranab Thakur (Mechanical Engineering, 1985)***

# The Literacy Disaster in India

*Subhamay Chattopadhyay, Instrumentation and Electronics Engineering, 1983*

A cursory look at the literacy map of the world will unveil the following uncomfortable fact. The global literacy rate for all people above 15 years of age is 86.3% whereas for India it is at 74.4%. Interestingly, if we consider only the youth (15 to 24 years), the world stands at 92% whereas India stands at 92% also. Apparently, it puts all our recent effort in school education, particularly the Right to Education Act and the ensuing compulsory education for all children in the age group of 6 to 14 in good light. However, behind these cold statistics hide a tragedy of enormous proportion.

First let us get the demography of India in short. Today we are a country of 138 crores, 65% rural, 35% urban, 29% (0-14), 21% (15-24) and 50% (25 and above). In number they work out as

|              |           |
|--------------|-----------|
| 0-14         | 40 crores |
| 15 to 24     | 29 crores |
| 25 and above | 69 crores |

Studies by Pratham Education Foundation called Annual Status of Education Report (ASER) have been pointing out since 2005 that learning outcome of school children has been steadily declining and as of 2016, in rural India, less than half of the children at Class 5 and 27% of children of Class 8 cannot fluently read a Class 2 text. This means that out of the 29 crores of youth of the country, the often-highlighted demographic advantage of the country, nearly 5 crores are not literates in true sense of the word. This is 18 % of their population. So much for our claim that 92% of them are literate.

Unfortunately, there is no standard definition of literacy in India, neither it is measured at a national level. In the general sense of the word anyone who can sign his name passes off as literate in India. However, in the academic and international arena the definitions are more stringent. In one definition, given a paragraph on his life and three questions on it, one has to read the paragraph and the questions which cannot be answered by quoting portions of the text only and write the answer. In another, literacy will enable a person to improve his/her quality of life through lifelong education. One can well imagine that by applying this standard, where does the real level of literacy stand in India?

However, we will make a rough estimate by the available data of 2014 by NSS 71st Round:

Education in India:

| Level               | Rural (%) | Urban (%) |
|---------------------|-----------|-----------|
| Illiterate          | 35        | 16        |
| Up to Primary       | 23        | 17        |
| Up to Upper Primary | 17        | 16        |
| Secondary and       |           |           |
| Higher Secondary    | 20        | 30        |
| Graduate & above    | 4         | 18        |

If we take secondary (Class 10) as per current RTE as the basic level of literacy meeting the more stringent demands of the above definition, then 75% of rural and 49% of urban adults are not literates. This works out to a staggering total of 66 crores when applied to the 15+ age group. This is 49% of our whole population & not 25.6 % as claimed in all official statistics.

This means that 66 crores of our population including 5 crores of rural youth are not able to take benefit of all the fruits of our democracy let alone improve their life in foreseeable future. The effects are manifold:

1. This accelerates the divide between the privileged and the under privileged
2. The public discourse is dominated by their needs
3. Scientific reasoning, removal of superstition and open argument go for a toss.
4. In an increasingly information and knowledge driven world, India is slowly pushed back.
5. India becomes the biggest drag behind attaining the various sustainable development goals the world is striving for.

Strangely enough, there is not much public debate on this crucial aspect of our national life. Year after year both national & state budgets do not allocate sufficient funds for this purpose. This should be agenda number one for the country. Adult Education is a much-neglected area in development, academic, political or even corporate social responsibility discourses.

The purpose of this short essay is to bring the attention of the reader to this gigantic national issue and actively debate for its resolution.

#### Reference:

1. UNESCO Institute of Statistics 2018
2. Annual Status of Education Report (Rural) 2016 by ASER Centre New Delhi
3. Why India Failed in Literacy: An Intimate Look into India's Learning Crisis, Ratneswar Bhattacharya, Amazon, 2019



## **‘HELP! PROJECT #COVID-19’ and ‘Cyclone Amphan Relief Fund Raiser’ – two praiseworthy efforts**

These are indeed uncertain times! Many people are terming it as the worst humanitarian crisis after World War II. Just a year ago, the phase we are going through could have been a very potent fictional plot for a blockbuster movie. How times change!

Nations are putting up their best efforts to tackle with the current situation. While human resource is one of the biggest strengths of India, high population has its manifold negative effects too. Whatever the government does, it almost inevitably falls short of the requirement, especially in crisis situations like these. As responsible citizens, we must come forward and help in whatever way possible in these trying times.

That is what some of our young Alumni members decided to do. Pained by the sufferings of daily wagers, migrant laborers, marginalized communities and other vulnerable sections of society, they decided to organize a crowd-funding project using the AANCEBJU DC platform. The idea was extremely novel and equally daring! This type of crowd-funding initiative for philanthropic activities had not been undertaken before by our association. However, in response to the unprecedented crisis we simply decided to go ahead with the effort!

The initial response was lukewarm. We started by putting up e-posters every day in our different forums requesting for donations. Funds came in only in small trickles. Whatever we gathered, we were distributing those to different organizations and showcasing their work in social platforms. This slowly started building up members’ interest. The donations started increasing and then there was no looking back!

It is often said that disaster strikes in pairs. That is exactly what happened to our home state. Already reeling under the Covid pandemic, the cyclonic storm Amphan brought the state completely to its knees. We were in two minds. What should we do? Should we stop the Covid19 fundraiser and start raising funds for Amphan? Should we just ignore the Amphan issue and continue with Covid relief work? Or should we do both? After some discussion, we decided to start a special 10-day ‘Cyclone Amphan Relief Fund Raiser’. We had a lot of doubts about what the response would be. After all, people have recently contributed for Covid. Will they contribute again?

Well, within 2 days our doubts were gone. People started to contribute more zealously than before. Maybe people connected more to the Amphan disaster. It is hard to ignore the call of one’s roots!

We helped 19 organizations and groups of individuals from the Amphan fund. The photos of the utterly destroyed house of Bani, a JU student, that was circulated in our WhatsApp group must have touched the hearts of many. With our limited funds, we helped him and 12 other JU students to rebuild their houses.

The utilization of the Covid fund was much more extensive. 14 organizations, 7 migrant worker groups and 11 individual volunteers were assisted with this fund. The donation of our Alumni brothers and sisters not only provided food and ration for many families, but also helped people in many other ways such as in moving back to their villages, getting medical assistance, etc. Apart from providing funds, we also coordinated with DM, BDO, IPS and IAS officers of West Bengal, Nagaland and Rajasthan to reach out to migrant workers of these states. Throughout this process, we kept close contact with all the stakeholders to ensure that the funds are properly utilized and that help reached even the remotest and most affected individuals. Some of the groups that deserve special mention are Chhou and Jhumur dance artists of Purulia; handloom, sculpture and stone carving artists of Bankura and the transgender community of north Bengal. Our tireless efforts made us vital and trustworthy point of contact for renowned organizations like SWAN and Ajeevika Bureau.

The amount of donation we have received was completely beyond our expectation when we started these efforts. Our sincere thanks to all the donors whose contributions are the main catalyst for taking this activity ahead. We feel really proud to be part of such an esteemed organization, whose members, most of them without knowing us personally, have trusted us and stood beside us in the name of Alumni kinship!

We surge ahead!

(The main volunteers for this project are of the opinion that charitable and voluntary activities as these should not be publicized. At their request, no names, including that of the author, have been mentioned in this report.)

# (Extra)Ordinary!

*Kunal Mandal, Production Engineering, 2010*

While in quarantine, Newton apparently discovered gravity and invented calculus; Shakespeare wrote King Lear, Munch painted masterpieces. Their curiosity changed the way we understand the world around us. For many of us, our daily lives now upended by quarantine, our homes have suddenly become our world. My curiosity about 'this world' led me to ordinary everyday objects that surround us at home and the extraordinary backstories they have! And thus began 'Stuff Tales' - a podcast that is bound to change the way you look at the world around you. Listen to it here: [www.wyn.studio/ST](http://www.wyn.studio/ST). My other escapades and musings can be followed on instagram and twitter @kunalju.

This quiz is all about those ordinary things that probably touches your lives everyday but you hardly pay any attention to them. Try guessing the objects and remember, the answer may just be around the corner! And if you end up liking this quiz, do check this out - <https://linktr.ee/gyaanspace> and send me your valuable feedback to [kunal@gyaanspace.com](mailto:kunal@gyaanspace.com).

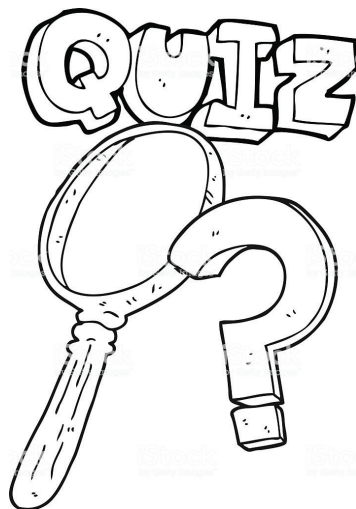
1. One day in 1945, a Raytheon engineer named Percy L. Spencer was walking through a radar test room with a chocolate bar in his pocket; he came too close to a running magnetron tube and the candy began to melt. This led to the invention of what modern day device that most bachelors consider as 'magic' in their life?
2. This indispensable household object was first described in 1596 by English courtier Sir John Harington in a satirical pamphlet entitled "A New Discourse on a Stale Subject, called the Metamorphosis of Ajax". Harington's device called for a 2-foot-deep oval bowl waterproofed with pitch, resin and wax and fed by water from an upstairs cistern. A working model was originally installed for Queen Elizabeth at Richmond Palace. What device is this?
3. YI XING was a bit of an overachiever - a mathematician, engineer, Buddhist monk and astronomer! Xing was asked to improve calendars in China. He took it one step further, building upon centuries of Chinese innovation to create the "Water-Driven Spherical Bird's-Eye-View Map of the Heaven." This was one of the earliest versions of what everyday item that in many ways is responsible for 'human awakening'?
4. This food item was invented for and named after John Montague, a British politician and a marathon gambler who wanted a dish that would sustain him throughout long gambling games, and be mobile enough to bring to him throughout. Also it should be such that he can keep gaming with one hand and eat with the other. What versatile snack thus came to be?
5. Sackett & Wilhelms, a printing company in Brooklyn, New York found that the summer time humidity was causing havoc with the color register of its fine, multicolor printing. Ink, applied one color at a time, would misalign with the expansion and contraction of the paper stock. They asked Willis Haviland Carrier, a young electrical engineering graduate from Cornell University to solve this issue. What solution did Willis come up with that comforts us till date?
6. The base technology for what was patented as the 'Secret Communications System' by the Hollywood actress Hedy Lamarr and the eccentric pianist George Anthcil? Hint: You can't possibly live without it these days.
7. In 1979, Gillis Lundgren, an employee at IKEA, designed this and named it BILLY. Since the first one rolled off the manufacturing line, IKEA has sold more than 41 million of these worldwide. It remains the company's best selling item, with fifteen made every minute. What everyday household item is BILLY?
8. This very commonly used item, when displayed for the first time in September, 1898, at Madison Square Garden by Nikola Tesla, it caused, in Tesla's words, "a sensation such as no other invention of mine has ever produced." The first usable version of this was introduced by the Zenith Radio Corporation in 1950 as 'Lazy Boy' and 'Flash-Matic'. What everyday item are we talking about?

9. The first observations of this was possibly made in 1492 by Rodrigo de Jerez while on Christopher Columbus's expedition to the Americas. He referred to these as 'paper muskets'. After returning to Spain he was imprisoned for 7 years for use of these. Ironically, by the time he got out of jail this had become very common in the Spanish society. What are we talking about?

10. During the 1760, John Spilsbury put his map-making and engraving skills together to help British children develop their knowledge of geography. The products that he created got its name from a carpenter's tool that was used to make these. This hobby/game activity became extremely popular during this quarantine time. What are we talking about?

### Answers:

- |                                                                                                      |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Microwave Oven;                                                                                   | 6. Wi-Fi (Full story here: <a href="https://bit.ly/2Xy0dzj">https://bit.ly/2Xy0dzj</a> ) ; |
| 2. The flush toilet;                                                                                 | 7. A bookshelf;                                                                            |
| 3. Alarm Clock;                                                                                      | 8. TV remote ;                                                                             |
| 4. Sandwich. His title was the '4th Earl of Sandwich';                                               | 9. Cigarettes or smoking;                                                                  |
| 5. Air Conditioner (Full story here: <a href="https://bit.ly/2Y4YaBR">https://bit.ly/2Y4YaBR</a> ) ; | 10. Jigsaw puzzles                                                                         |



# Punnyo

*Cdr Samir Roy Choudhury IN (Retd), Electrical Engineering, 1968*

This is the story of a simple person who used to be almost one of our household members during my childhood. I say ‘almost’ because he never used to stay at our house at night. He was a permanent presence at home during daytime.

This is a real life narration set in the fifth decade of the past century. I was a school going kid residing in Selimpur in southern Calcutta (now Kolkata). Our house was set on about half a bigha of land with some outhouses and lots of trees and a garden. Some of these outhouses were rented and some kept for our own use. We had two mango trees, four coconut trees, four betel nut trees, one guava tree apart from other flowering trees. We had a well in our compound which used to provide water for the garden as well as for bathing. The idea of giving this scenario is to make the reader understand the extent of work that I am going to describe in the succeeding paragraphs.

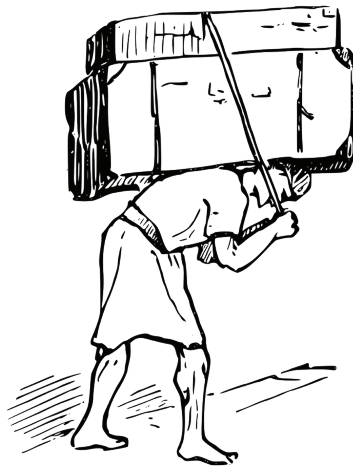
There was this gem of a person called ‘Punnyo’ who would have been a few years older than my father. He was from the Santhal district in the West Bengal – Bihar border. He had a weather beaten, ebony coloured body without an iota of fat anywhere, with a flock of jet black hair, always shining with oil, up to his shoulders. His body was all gleaming muscles without being in the shape of a bodybuilder. He had a red coloured gamcha (our village towel) tied around his head. He was always dressed in a tucked-in tight spotless white dhoti which came up to just below his knees. Apart from that he was always bare bodied and bare footed come rain, sun, fog, mist or drizzle. I remember seeing him coming to our house almost every day from the time I could remember till when I was about 20 - 21 years old when I left home to seek a career for myself after graduating from Jadavpur University, College of Engineering and Technology (CET). In these more than dozen years I recall that he did not seem to have aged at all. Even if he did, which of course he did, it was not evident. He had a shiny row of milk white teeth with a subtle smile always on his face. Whether he had a family or not I never knew. I also did not know where he stayed except that he stayed somewhere in the ‘basti’ near the Ballygunje – Budge Budge railway line passing near the Dhakuria lakes close to the cross over from the end of Jodhpur Park to the main lakes.

Punnyo will come to our house almost every day, seven days a week, little after sunrise and will stay till sunset when he will take leave and go. He used to work as the odd job man around house basically looking after the gardens, trees and buildings and anything else that was required to be tended. I do not recall seeing or hearing either my father, mother or grandmother ever telling him what to do for the day except on some rare occasions when there was something specific to be done. He would on his own find out what needs to be done and start working. He would always spend the first few hours tending to the trees then check around the pathways in the garden. When required he would also cut bamboos, make fences, paint the fences with molten tar. To melt the tar he would put few bricks on the ground put some twigs and make a fire and put the tar can on it. When the pathways in the garden required attention he would ask father to get bricks and he would align the bricks along the pathways, make lime mixture and paint the bricks etcetera.

During school holidays or when I had nothing much to do, I would tag along with him while he used to do his chores. He would dote on me and take me like an apprentice and tell me various nuances of his work. Before trimming or cutting trees or climbing them to pick coconuts or betel nuts or mangoes or guavas he would revere the trees and ask forgiveness for intruding into their privacy or doing any harm. He taught me how to read the wind, how to check the clouds and predict rains. He taught me how to make railings and trenches to guard the hen pens against foxes so that they do not create any trouble at night. He taught me how to remove tar or paint, for that matter anything sticky, from the hands using mustard oil. This is what he used to do before having his lunch if he was painting or using tar. In later life I learnt that mustard oil would keep the skin in good shape. When my grandmother, who used to live with us, would be sick and there would be no one in the house except my mother who would be busy in her household chores, Punnyo would sit and chat with my grandmother – give her words of solace and do small talk, she in her East Bengalee accent and he in his Santhalee Bengali accent. They would talk for hours and my grandmother would sleep off in between.

Whenever there was a need to do small repairs to any parts of the outhouses, to build a shed outdoors for the coal for the kitchen, make a boundary hedge with wood or bamboo or any such job, Punnyo would quietly get going collecting materials, gauging what is to be done and do it. I learnt a lot about materials management, tools selection, work scheduling, job sequencing, build-a-little test-a-little and various other aspects of modern manufacturing techniques which is taught in our engineering colleges. And all this from a Santhali person who has not been to school and who could not read or write. When I was doing my engineering courses I used to correlate some of what was taught to me in classes with what I learnt from Punnyo during my childhood. At the end of each day before going home he used to collect the princely sum of Rupees Two from my mother. On his way back home in the evening he would probably buy groceries and food items for his family.

As years went by, I finished school, went to college and then went on to make a career. I lost touch with Punnyo. When I went home first time on leave after about two years I did not see Punnyo. I was told that he said that he was getting old and had gone back to his village in Santhal Parganas. I missed his presence. I used to think about his qualities. Maybe they do not make them like that anymore.



## গ্রামোফোন

অভিষেক গাঁতাইত, প্রিন্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং, ২০০৬

বাড়ির বাগানের দিকের জানালা দিয়ে কালো মেঘে ঢাকা আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম আনমনে। ফোনের শব্দে সন্ধিৎ ফিরলো। দাদার ফোন ছিল। দাদা বলতে আমার পিসতুতো দাদা - তোতন দাদা, ওরফে 'জঙ্গল দাদা'। দাদার এই বিশেষ নামের পেছনে এক মজার ঘটনা আছে। তখন আমার ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফার্স্ট ইয়ার এর শেষ। সামনেই summer vacation এর লম্বা ছুটি। এই ধরনের বড়ো ছুটি মানেই ছোটবেলা থেকেই আমাদের ভাই বোনদের সময় কাটানোর স্থান 'বড়ো পিসির' বাড়ি। এই ছুটিতে পিসিবাড়ি গিয়ে জানতে পারলাম, দাদা ভীষের প্রতিজ্ঞা নিয়েছে - সারা জীবন ব্রহ্মচর্য পালনের ব্রত এবং তার কারণ - দেশে বিদেশে জঙ্গল ঘুরে বেড়ানোর কঠিন সংকল্প! এই কথা শুনে বাড়ির সবাই এর তো চম্ফু চড়ক গাছ! আমরা ছোটরা ভয় পেয়ে ভাবতে শুরু করলাম, আমাদের ও বোধ হয় ভবিষ্যতে বিবাহ ভঙ্গের মতো অভিযানে সামিল হতে হবে! যদিও তখন অল্প বয়সের স্বল্প অভিজ্ঞতার জন্যে বিবাহ পরবর্তী জীবনে 'শাদী কা লাডডু' এর স্বাদ জানা ছিল না। দাদার এ হেনো প্রতিজ্ঞার কথা শুনে বড়ো পিসেমশাই রসিকতা করে বললেন, "তোতন, তোমার নাম আমার দেওয়া উচিত ছিল জঙ্গলবাবু।" সেই থেকেই আমরা ছোটরা দাদা কে ডাকা শুরু করলাম - "জঙ্গল - দাদা" নামে।

যাই হোক দাদার ফোনের কথায় আসি। দাদা ফোনে বললো, "এবার অফিস থেকে পুজোর ছুটিতে দিন পনেরোর ছুটি নিয়ে নিস। সব ভাইবোনদের get together আছে তোদের পিসিবাড়ি তে। তারপর আমরা দুজনে সুন্দরবন বেড়াতে যাবো।" এই দুইয়ের যুগলবন্দিতে আশায় বুক বেঁধে রওনা হলাম দিল্লি থেকে বড়ো-পিসির বাড়ির উদ্দেশ্যে। পিসিবাড়ি পৌঁছেই সবাই মিলে হামলে পড়লাম পিসির হাতে বানানো সুস্বাদু লুচি -মাংসের উপরে। খাওয়া শেষে দুপুরের বৈঠকি আড্ডায় অনেক পুরোনো দিনের স্মৃতি মনের আঙিনায় উঁকি দিলো। আমরা কচি-কাঁচার ছুটি-ছাটা তে পিসি-বাড়ি এলে অনেক মজার উপকরণ পেয়ে যেতাম - পুকুরে সাঁতার কাটা, গাছে চড়া, গল্পের বই পড়া, নাটক করা আরো কত কি! এর মধ্যে দারুন আকর্ষণের অধ্যায় ছিল - দুপুরের ভুরিভোজের পরে দাদার তদারকিতে গ্রামোফোন রেকর্ড শোনা। বিভিন্ন রেকর্ড এর মধ্যে সবথেকে চিত্তাকর্ষক ছিল - 'আলিবাবা ও চল্লিশ চোরের গল্প'। আমি আবার এই রেকর্ড প্লেয়ার এ মজা করে লিখেছিলাম একটা জিনিস ....।

এইবারের ছুটিতেও যথারীতি সবাই মিলে খাওয়া দাওয়ার পরে দাদার ঘরে ঢুকে দেখলাম অবাক কান্ড! সাধের সেই গ্রামোফোন রেকর্ড-প্লেয়ার টি উধাও তার নির্দিষ্ট স্থান থেকে! কারণ জিজ্ঞেস করাতে দাদা খুব রেগে গিয়ে বললো, "গতকাল আমি যখন বাড়ি ছিলাম না, তোদের পিসিমনি বাড়ির সব পুরোনো জিনিসের সাথে ওটাও বিক্রি করে দিয়েছে ওজন দরে!" কিছুটা মর্মান্বিত হয়েই পিসিকে শুধোলাম, "এটা করলে কেন?" পিসি ঠোঁট বেঁকিয়ে উত্তর দিলো, "তোরা থাকিস কোথায় শুনি? আজ হিল্লি তো কাল দিল্লী। বেশ করেছি বিক্রি করে। কোন কাজে লাগতো শুনি ওটা?" বুঝলাম পিসির সাথে এ বিষয়ে কথা বলাই বৃথা। অতঃকিম দাদাকেই অনুরোধ করলাম কিছু একটা উদ্যোগ নিতে যাতে পুরোনো রেকর্ড প্লেয়ার টি পুনরায় স্বস্থানে ফিরে আসে। সন্ধ্যার দিকে, মুচমুচে পাঁপড় ভাজার সাথে চা খেতে খেতে কানে এলো দাদার উঁচু গলার আওয়াজ। হস্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে দেখি, দাদা হবিতস্তি করছে একজনের উপর, "তোর সাহস হয় কিভাবে? তুই আমার জিনিস নিয়ে যাস!" ছোট্টাখাট্টো মানুষটি হাত জড়ো করে বললে, "বাবু আমার কি দোষ? মা জননীই তো বললেন নিয়ে যেতে।" আমার মুখ দিয়ে প্রশ্ন ছিটকে বেরিয়ে এলো, "আর কি ফেরত পাওয়ার কোনো উপায় নেই?" শুকনো মুখ করে লোকটি জানালো, "না বাবু, অনেক দেবী হয়ে গিয়েছে। সে তো আমি বিক্রি করে দিছি।" হতাশ হয়ে ধপ করে আমি সেখানেই বসে পড়লাম। চায়ের কাপ রইলো হাতেই ধরা।

এ ঘটনার বেশ কয় বছর পরে .... স্বস্তীক ঘুরে বেড়াচ্ছি দিল্লীর হুমায়ুন মোকবরাতে। সেখান থেকে বেরিয়ে গাড়ি ছোট্টালাম রেহমান সাহেবের দোকানের উদ্দেশ্যে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, পুরোনো রেকর্ড সংগ্রহ করার অভ্যাস আমার বহুদিনের, আর তার যোগানদাতা এই রেহমান সাহেব। দোকানে পৌঁছতেই রেহমান সাহেব বেশ কিছু নতুন আসা সংগ্রহ আমাকে দেখতে শুরু করলেন। ঠিক তখনি আমার নজরে পড়লো দোকানের কোনের দিকটায়। জিজ্ঞেস করে বসলাম, "রেহমান সাহেব ওটা আবার কি?" উত্তর এলো, "গ্রামোফোন হুজুর, উমদা জিনিস আছে। কাল ই কলকাতা থেকে এসেছে। একবার দেখবেন নাকি?" সম্মতি জানাতেই তিনি আমার সামনে কাঁচের টেবিল টায় এনে বসালেন গ্রামোফোনটাকে। চমকে উঠলাম আমি! গায়ের লোম খাড়া হয়ে এলো, his masters voice এর ছবিটার দিকে তাকিয়ে। হুম! তলায় সেই এক ই ক্ষুদ্রে অক্ষরে লেখা 'জঙ্গল-দাদা!' আমি ই তো লিখেছিলাম। সময়ের পলি পড়লেও লেখাটা এতো বছর পরেও চিনতে অসুবিধা হলো না। পুরোনো এই অতিপ্রিয় জিনিসটা হাতে পাওয়ার আনন্দে গলা অবরুদ্ধ হয়ে এলো। ধীরে ধীরে হাত দিলাম তার আবলুশ রঙা চৌকো বাক্স খানার উপরে। স্পর্শ করলাম সেই সোনালী চিকন মাইকটাকে, যেটা আজ মাথা উঁচু করে আছে গর্বের সাথে। নাঃ, এ জিনিস আর কারোর নয় আমার প্রিয় জঙ্গল দাদার ছাড়া। একসাথে অনেকগুলো অনুভূতি আমাকে হতবাক করে দিলো।

বহুকষ্টে নিজের হুঁশ ফেরালাম। রেহমান সাহেব কে ধন্যবাদ জানিয়ে যৎকিচিৎ বেশি অথেষ্ট কিলে নিলাম জিনিসখানা। পুরো রাস্তা হাতছাড়া করলাম না গ্রামোফোন টা কে। বাড়ি ফিরেই ফোন লাগলাম ভাই-বোন দের। সবিস্তারে জানাতেই তারাও খুশি হলো আমার মতোই। সবাই মিলে প্ল্যান করে ফেললাম দাদার জন্মদিনের।

অতঃপর এলো সেই বহু প্রতীক্ষিত সন্ধ্যা। কেক কাটার পরে দাদার হাতে সবাই মিলে তুলে দিলাম গিফট wrap করা গ্রামোফোন টা কে। সোনালী ফিতের বাঁধন খুলতেই বেরিয়ে এলো সেটা। সবার দৃষ্টি তখন দাদার দিকে। ততক্ষণে দাদার কাঁপা হাত ছুঁতে শুরু করেছে গ্রামোফোন টা কে। অশ্রুসজল চোখে দাদা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "বাবাই! এই কি আমার সাধের গ্রামোফোন টা?" মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই দাদা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। সেই দেখাদেখি বাকিরাও। রান্নাঘর থেকে পিসি ছুটে এলো আমাদের আওয়াজ শুনে। সব শুনে দেখলাম আমার অমন বজ্রকঠিন পিসির চোখের কোনায় চিকচিক করছে জল। ভালোবাসার ছোঁয়ায় ভিজে উঠলাম সবাই। কান্নাকাটির পর্ব সমাপ্ত হতেই পিসি সবাইকে বসিয়ে দিলো রাতের ভুড়িভোজনে। খাওয়াদাওয়ার শেষে আমরা সবাই ছুটলাম দাদার ঘরে। গ্রামোফোন টা কে সবাই মিলে ঘিরে বসতেই দাদা চালিয়ে দিলো, 'আলিবাবা ও চল্লিশ চোর'। রেকর্ড প্লেয়ার এর স্টীল রঙা সূচ টা যখন ছুঁলো রেকর্ড এর কালো শরীরটাকে বাইরে তখন জ্যোৎস্না রাত। নিস্তব্ধ চরাচরের মাঝে বেজে উঠলো অবদান্না মর্জিনার প্রথম গান। আর আমরাও জড়িয়ে ধরলাম ছোটবেলাটাকে - শীতের চাদরের মতো।



## ধর্মাত্তর\*

দুলাল চন্দ্র মিত্র, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ১৯৭০

২০১৭ সালের গ্রীষ্মকালে আমরা জাহাজে বাল্টিকসাগরের উপকূলবর্তী বিভিন্ন দেশ ঘুরে শেষে এসেছি ফিনল্যান্ডের হেলসিন্কে শহরে যেখান থেকে আমরা দিল্লি ফিরে আসব। আশা করিনি সেখানে এক অভূতপূর্ব ঘটনার সাক্ষী হতে হবে।

হেলসিন্কে কাছের ইউনেস্কোর একটি বিখ্যাত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ট্যুরিস্ট স্পট আছে – গালফ অফ ফিনল্যান্ডের মধ্যে, যার নাম ‘শুয়ামেলিন্মা’। এটা কয়েকটি দ্বীপের সমষ্টি যা ‘অষ্টাদশ শতাব্দীর সমুদ্র দুর্গ’ নামে ইউনেস্কোর লিস্টে আছে। সমুদ্রপথে ফেরী করে যেতে হয়, ১৫/২০ মিনিটের পথ হেলসিন্কে মার্কেট স্কোয়ার থেকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই অঞ্চল সুইডেনের অধীনে থাকাকালীন নৌবাহিনীর বন্দর হিসাবে এবং তৎকালীন বিশ্বের বৃহত্তম ড্রাই ডক হিসাবে বিখ্যাত ছিল। এখনও সেই প্রাচীন নিদর্শন হিসাবে বেশ কিছু কামান, সংরক্ষিত দুর্গের বা চার্চের আর্কিটেকচার ইত্যাদি বর্তমান।

ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে আর তার মধ্যেই সকালবেলা আমরা ফেরী করে ওখানে গিরে নামলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় আছে ঘুরে দেখার। অতি মনোমুগ্ধকর সেই জায়গা। সমুদ্রের মাঝখানে চারিদিকে সবুজের সমারোহ। কত অজানা রঙ বেরঙের ফুলের ডালি প্রকৃতি গাছের ওপরে, নীচে, আশেপাশে সাজিয়ে রেখেছে ভ্রমণবিলাসীদের আপ্যায়নের জন্যে। আর তার তলায় অসংখ্য রাজহাঁস, পাতিহাঁস, সিগ্যাল আরও অনেক পাখি শুয়ে বসে আছে বা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারই মাঝে আছে বিশাল সামরিক দুর্গ যা বিশেষভাবে সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত। সব ঘুরে দেখতে দেখতে বেশ বেলা হয়ে গেল। থিমে পেয়েছে তাই কোনও রেষ্টোরার খাঁজে বেরলাম। ছোট দ্বীপ যেখানে ৩৫০ মত সরকারী আবাসন আছে আর আছে অতি সামান্য কিছু পুরোনো দিনের বাড়ি ও তার বাসিন্দারা। আছে ১০-১২টা মত রেস্টুরেন্ট ও সামান্য কিছু ছোট দোকান যারা কিছু সুভোনির ও গিফ্ট আইটেম বিক্রি করছে। রেস্টুরেন্ট যাবার পথে হঠাৎ চোখে পড়ল একটা দোকানের শো-কেসে কিছু ভারতীয় শিল্প নিদর্শন। যেমন চন্দনকাঠের গণেশ মূর্তি, রাধাগোবিন্দের মূর্তি, শিব মূর্তি ও আরও অনেক কিছু। আমরা নিবিষ্ট চিত্তে দেখছি। হঠাৎ পেছন থেকে মিষ্টি মেয়েলী কণ্ঠের আওয়াজ “মিত্রাজি আপ ক্যাসে হ্যায়?” অসম্ভব চমকে গেলাম। তুল শুনলাম নাকি? এই সুদূরে ছোট দ্বীপে কে ডাকে রে বাবা! ফিরে দেখি এক অতি সুন্দরী সুবেশা চল্লিশোর্ধ্ব এক মহিলা বা তখনও যুবতী বললেই বোধহয় ঠিক হয়। খুব চেনা মনে হচ্ছে কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলাম না তার নাম বা কোথায় দেখেছি। নাম ধাম মনে রাখার ব্যাপারে আমার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। আমার স্ত্রীর এই ব্যাপারে যথেষ্টই অভিজ্ঞতা আছে তাই কিছু না বলে অবাক হয়ে আমাদের দুজনকে দেখেছে। মহিলার আবার সহাস্য প্রশ্ন – বাংলাতেই তর্জমা করে বলি – “কি হল চিনতে পারলেন না?” আমি আমতা আমতা করছি দেখে বললেন – “মনে করিয়ে দিচ্ছি। আপনার ম্যাঙ্গোলোর, বিশেষ করে হোন্নাভারের কথা মনে আছে?” এক বিদ্যুৎ ঝলকের মত মনে পড়ে গেল সমস্ত কথা – সোনিয়া, রোহন, ডব্লিউসুরের পাহাড় আর সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। খুলে বলি –

প্রায় ১৪ বছর আগের কথা। তখন প্রায়ই ম্যাঙ্গোলোরে যেতে হত একটা ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স বানানোর কাজে। অনেকখানি জমি নিয়ে সমুদ্রের ধারে বেশ কিছু কটেজ ইত্যাদি বানানোর কাজ চলছিল। জায়গার নাম হোন্নাভার। ম্যাঙ্গোলোর থেকে প্রায় ১৮৫ কিমি দূর গোয়া যেতে। আমি অবশ্য গোয়া থেকে গাড়ি করে যেতাম ৭০ কিমি ন্যাশানাল হাইওয়ে-৬৬ ধরে কারোয়ার, গোকর্ণ, কুমটা হয়ে হোন্নাভার। অতি সুন্দর রাস্তা। আশেপাশে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, পাহাড়ের পাশ দিয়ে, কখনও কখনও সমুদ্রের পাশ দিয়ে, নীল আকাশের নীচে – সব মিলিয়ে যাত্রাপথ অতি মনোরম।

প্রায় ১৪ বছর আগের কথা। তখন প্রায়ই ম্যাঙ্গোলোরে যেতে হত একটা ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স বানানোর কাজে। অনেকখানি জমি নিয়ে সমুদ্রের ধারে বেশ কিছু কটেজ ইত্যাদি বানানোর কাজ চলছিল। জায়গার নাম হোন্নাভারা ম্যাঙ্গোলোর থেকে প্রায় ১৮৫ কিমি দূর গোয়া যেতে। আমি অবশ্য গোয়া থেকে গাড়ি করে যেতাম ৭০ কিমি ন্যাশানাল হাইওয়ে-৬৬ ধরে কারোয়ার, গোকর্ণ, কুমটা হয়ে হোন্নাভারা। অতি সুন্দর রাস্তা। আশেপাশে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, পাহাড়ের পাশ দিয়ে, কখনও কখনও সমুদ্রের পাশ দিয়ে, নীল আকাশের নীচে – সব মিলিয়ে যাত্রাপথ অতি মনোরম।

ঐ যে বললাম কুমটা হয়ে যেতে হত, তা সেই কুমটা যা ওয়েস্টার্ন ঘাট পাহাড়ের অংশ খুবই বিখ্যাত আকর্ষণ ভ্রমণ বিলাসীদের। আসলে ঠিক কুমটা নয়, কিন্তু কুমটা শহরের ২৪ বা ৩০ কিমি দূরেই আছে ইয়ানা, যেখানে ভাস্কাসুরের পর্বতই সব থেকে আকর্ষণীয়। ওখানে দুটো বিখ্যাত পর্বত শিখর আছে ইয়ানা, যেখানে ভাস্কাসুরের পর্বতই সব থেকে আকর্ষণীয়। ওখানে দুটো বিখ্যাত পর্বত শিখর আছে যার একটা ভৈরবেশ্বর শিখর আর অন্যটা মোহিনী শিখর। যেন মনে হয় শৈব আর বৈষ্ণবের মিলন তীর্থ। পৌরাণিক তথ্য অনুযায়ী ভাস্কাসুর নামে এক অসুর, ভগবান শিবের কাছ থেকে বর পেয়েছিল যে সে যার মাথায় হাত রাখবে সে তৎক্ষণাত্ ছাই হয়ে যাবে। বর প্রাপ্তির পর তার সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য ভাস্কাসুর ভগবান শিবের মাথায় হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে যায়। ভগবান শিব ভয়ে নিজের জায়গা ছেড়ে পালাতে যায় আর পেছনে ছোট ঐ অসুর। ওই কান্ড আর হাস্যকর অবস্থা দেখে স্বয়ং বিষ্ণু ভগবান ব্রাণকর্তা হয়ে ওনাদের দুজনের মাঝে অতি সুন্দর নারী রূপে বা অপরূপা মোহিনী রূপে প্রকাশ হন। ভাস্কাসুরের ছোট্টা তখন মাথায় উঠে গেছে। সে ভগবান শিবকে ছেড়ে মোহিনীর প্রেমে পাগল হয়ে তাকে বিবাহ করতে অনুমতি চায়। মোহিনী এক শর্তে রাজী হয় যদি ভাস্কাসুর মোহিনীর সঙ্গে নৃত্য প্রতিযোগিতায় মোহিনীর মুদ্রা অনুকরণ করে তাকে পরাস্ত করতে পারে। নৃত্য প্রতিযোগিতা শুরু হল আর তারই মাঝে মোহিনী এক বিশেষ মুদ্রায় নিজের মাথায় হাত রাখেন ও তার অনুকরণে বরপ্রাপ্তির কথা ভুলে ভাস্কাসুর নিজের মাথায় হাতে রাখে ও সঙ্গে সঙ্গে ভস্ম হয়ে যায়। পাহাড়ে ঐ জায়গা অনেকটাই সমতল আর ওখানে কিছু মন্দিরও আছে ভৈরবেশ্বরের, বিষ্ণু, মোহিনীর ইত্যাদি সমস্ত পাহাড়টাই কঠিন কালো কৃষ্ণাল সেডিমেন্টরি পাথরের যার ওপরের অংশ আশ্চর্য্যভাবে কালো ভস্ম বা ছাইতে ভরে আছে। পরিষ্কার বোঝা যায় ঐ ওপরের অংশ আশ্চর্য্যভাবে কালো ভস্ম বা ছাইতে ভরে আছে। পরিষ্কার বোঝা যায় ঐ ওপরের চূনাপাথরের অংশ কোনও ভয়ানক অগ্নিকান্ডে ছাই হয়ে গেছে। পৌরাণিক কথায় বিশ্বাসী লোকদের কাছে ওটা ভাস্কাসুরের ছাই। আমরা পরে ওখানে গেছি ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ঝর্ণাপার হয়ে আঁকাবাঁকা পথে প্রায় ৩-৪ কিমি হেঁটে পাহাড়ি রাস্তায়। চারিদিকে জোঁকে ভর্তি আর অনেক বিশাল বিশাল মৌচাকের নিচে দিয়ে সাবধানে যেতে হয়। কিন্তু সব মিলিয়ে অপরূপ নৈসর্গিক দৃশ্য যা বর্ণনা করতে গেলে শেষ হবার নয়। তাই মূল ঘটনায় ফিরে যাই যে প্রসঙ্গে এত ভূমিকা করলাম।

তা সেই সময় অনেকবার ভেবেছি একবার ঐ পাহাড়ে যাব। শেষে একদিন আমি আর আমার এক সহকর্মী বিনয় নায়েক সকালবেলায় আটটা নাগাদ রওনা হলাম ভাস্কাসুর পর্বতের উদ্দেশ্যে। ভৈরব অলঙ্কার মুচকি হাসলেন কারণ তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না। আমরা যখন যাত্রাপথের অর্ধেক রাস্তায় পৌঁছেছি, দেখি রাস্তায় এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। এক মালবোঝাই লরির সঙ্গে এক মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। মোটর সাইকেল চাকার তলায় পড়ে আছে আর চাকার পাশে এক সুঠাম বলিষ্ঠ যুবক রাস্তার ওপর ছটফট করছে। সম্ভবত দু-তিন মিনিট আগেই ঐ দুর্ঘটনা হয়েছে। ওখানে রাস্তার পাশে কিছু কাজ হচ্ছিল তাই ভীড় করে অনেকে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কেউই এগিয়ে এসে সাহায্য করছে না। আর এরই মাঝ দিয়ে গাড়ি চলে যাচ্ছে কিন্তু কেউ থামছে না। আমার ড্রাইভারও ঐ একইভাবে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। পরমুহুর্তেই আমার মাথায় যেন কষাঘাত হল। মনে হল এ আমি কি করছি! শিব দর্শন বেশী প্রয়োজনী না ঐ ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। ড্রাইভারকে বললাম গাড়ি ঘোরাও। ভাবলাম এই যুবককে এই অবস্থায় ফেলে রেখে মন্দিরে গেলে ভগবান কি আমার উপর তুষ্ট হবেন না কি

কষ্ট? ড্রাইভারের প্রচণ্ড অনীহা ফেরত্ যাবার আর আমার সহকর্মীও বলল যে স্যার ঐ ঝামেলায় যেয়ে দরকার নেই বোঝালাম যে আমরা মন্দিরে ও পাহাড়ে কাল যেতে পারি কিন্তু এখন যদি ঐ ছেলেটিকে সাহায্য করি সম্ভবত বেঁচে যাবে আর ঈশ্বরও আমাদের আশীর্বাদ করবেন। আমরা ফিরে এলাম ওকে সাহায্য করার জন্য। ছেলেটির জ্ঞান ছিল আর যন্ত্রণায় কাঁদছিল। ওর ডানপাটা ভেঙ্গে উল্টো দিকে হয়ে গেছে, রক্তে চারিদিকে ভেসে গেছে। মাথায় হেলমেট থাকার জন্য মাথায় চোট লাগেনি বা শরীরের অন্য কোথাও বিশেষ আঘাত লাগে নি। ধরাধরি করে আমার ইনোভার পেছনে কোনও রকমে তুলে হোন্ডারের দিকে রওনা দিলাম। সঙ্গে ট্রাক ড্রাইভারকে নিলাম; আর কেউ যেতে রাজি হল না। ট্রাক ড্রাইভারের কথা অনুযায়ী সে একজন রাস্তার কর্মীকে বাঁচাবার জন্য একটু পাশ কাটায় কিন্তু ঐ যুবক অত্যন্ত প্রচণ্ড বেগে আসার জন্য নিজেকে কন্ট্রোল করতে না পেরে ঐ দুর্ঘটনা ঘটায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওকে আমরা ওখানের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়ে পুলিশে খবর দিই। যেহেতু ট্রাকড্রাইভার সঙ্গে ছিল আমাদের কোনও অসুবিধা হয়নি পুলিশের কাছে। ইতিমধ্যে আমরা ছেলেটির মোবাইল নিয়ে তাদের বাড়িতে খবর করে দিয়েছিলাম। সেখান থেকে জানাল ছেলেটির নাম রোহন, যথেষ্ট অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, সবার বড় আর কিছুদিন আগেই বিয়ে হয়েছে। ওদের খনিজ পদার্থ এক্সপোর্টের বড় কোম্পানী আছে আর সেই সূত্রেই ও যাচ্ছিল ম্যাঙ্গালোর। আমার খবর পাওয়া মাত্রই ওরা রওনা দিয়ে দিয়েছিল এখানে আসার জন্যে। ততক্ষণে ডাক্তাররা কিছু চেষ্টা করছিল কিন্তু অতবড় অপারেশন করার মত তাদের প্রস্তুতি ছিল না। তাছাড়া রক্তের প্রয়োজন ছিল আর আমাদের দুজনের রক্ত ম্যাচ করল না। ওকে কোনো বড় হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য বলল। ততক্ষণে ওর মা, বাবা, ছোট ভাই আর নববিবাহিতা স্ত্রী সোনিয়া এসে হাজির। ওর মা-বাবা নিজেদের পরিচয় দিয়ে ওর স্ত্রীর সাথে পরিচয় করাল। অপরূপা সুন্দরী যুবতী মনে হয় এই বোধহয় পৌরাণিক যুগের মোহিনীর কপি। প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের পর ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর ওর ভাই গেল ওদের মুম্বাই যাবার টিকিট কাটাতে। ওরা ওকে মুম্বাইর যশলোক হাসপাতালে নিয়ে যাবে যেখানে ওনাদের কোনও বড়মাপের ডাক্তার ওনাদের আত্মীয়। ক্রমশ জানা গেল যে ওনারা কর্ণাটকের হেভিয়াক ব্রাহ্মণ সমাজের এক গাঁড়া পরিবার। বড় ছেলে রোহণ হেগড়ে আর তার বউ সোনিয়া হেগড়ে। গোকর্ণের কাছেই ওদের বাড়ি। এরপর আমরা রোহনের দায়িত্ব ওনাদের হাতে দিয়ে চলে এলাম। পরদিন সকালবেলাই ওনারা সবাই আমার হোটেলে এসে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন যে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা রোহনকে গ্যাম্বুলেট্রো করে ম্যাঙ্গালোরে গিয়ে প্লেন ধরবে মুম্বাই যাবার জন্য। সোনিয়া আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ করল যেন আমরা আসা যাওয়ার পথে ওদের বাড়ি যাই। অবশ্যই রোহনকে ভাল করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার পর। কথা দিলাম নিশ্চয়ই যাব, কিন্তু তখন জানি না কি আশ্চর্যভাবে আবার কোথায় দেখা হবে। ওর বাড়ির ঠিকানা আর ফোন নাম্বার দিল যার আর কোনও দিনও প্রয়োজনই হল না।

পরদিন মুম্বাই থেকে সোনিয়া ফোন করে জানাল রোহন ভর্তি হয়েছে আর পরদিন অপারেশন হবে। জ্ঞান আছে তবে পায়ের যন্ত্রণায় ছটফট করছে। আমরা তার পরদিন ইয়ানা গিয়ে শিখর, মন্দির দর্শন করে পরদিন দিল্লি ফিরে আসি।

তারপর দশদিন আমিও যাইনি বা কোনও খবর পাইনি। এগার দিনের মাথায় আবার গেলাম হোন্ডারো। প্রথমেই পৌঁছে ফোন করলাম সোনিয়াকে। মিঃ হেগড়ে আমার পরিচয় জেনে সোনিয়াকে দিলেন ফোনটা কিন্তু ছেলের কথা জানতে চাইলে কোনও উত্তর দিলেন না। সোনিয়া কোনও কথা না বলে চুপ করে রইল কিন্তু মনে হল ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বার বার জিগোস করাতে কান্না জড়ানো গলায় বলল সে আর নেই। যা জানা গেল রোহনের হাঁটুর অংশটা গুঁড়িয়ে সেপটিক হয়ে যাচ্ছিল যার ফলে অপারেশন করা সম্ভব ছিল না তাই হাঁটুর ওপর থেকে কেটে বাদ দিতে হয়। রোহনের জ্ঞান ফেরার পর যখন দেখতে পায় ওর পা নেই সেই মানসিক শকে হঠাৎ হার্টফেল করে যায়। সেই সোনিয়ার সঙ্গে শেষ কথা বলা আর তারপর এই এত বছর পর এই নির্জন দ্বীপ সুয়ামেলিন্নাতে হঠাৎ দেখা।

আবার এই কাহিনীর শুরুতে ফেরা যাক। বললাম হ্যাঁ এবারে সব মনে পড়েছে। তারপর কি হল, আপনারা কে কেমন আছেন কিছুই জানি না। কারণ রোহনের মৃত্যু আমাকেও খুবই শোকাহত করেছিল। প্রশ্ন করলাম আপনারাও কি এখানে বেড়াতে এসেছেন? আপনার বাড়ির বাকী সবাই কোথায়। জবাব এল আমার কেউ নেই ভারতে। সব বলব, কিন্তু আগে বলুন আপনারা এই দোকানে কিছু কেনার জন্য দেখছেন না কি নির্দিষ্ট কোনও স্থানে যাচ্ছেন? বললাম না থিডে পেয়েছে তাই রেস্টুরেন্ট খুঁজছি, হঠাৎ চোখে পড়ল ভারতীয় কারুকার্য তাই দেখছিলাম। মোহিনী বললেন আর রেস্টুরেন্ট খুঁজতে হবে না, এই দোকানেই চলুন এটা আমার দোকান। আবার অবাক হবার পালা। জোর করে আমাদের নিয়ে দোকানের ভেতর ওর অফিসে বসালেন। ছোট্ট অফিসঘর কিন্তু সুন্দরভাবে সাজান। এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক দেখতে বেশ সুপুরুষ ও স্বাস্থ্যবান বসে কিছু কাজ করছিলেন। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে হাত মিলিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন – আমি সুলেমান আর সোনিয়াকে দেখিয়ে বললেন আমার স্ত্রী শবনমা আবার এক প্রশ্ন ধাক্কা খেললাম কি কাণ্ড কে বাবা! সোনিয়া এখানে এসে শবনম হয়ে গেল? সোনিয়া আন্দাজ করে বলল আপনারা বসুন, সব বলছি কিন্তু আগে খাবারের জন্য বলে দিই। ফোনে কাউকে চাইনিজ খাবারের অর্ডার দিলেন। অবশ্য আমাদের অনুমতি নিয়ে। আমরা উদগ্রীব হয়ে আছি দুর্ঘটনা পরবর্তী সব কাহিনী শোনার জন্য। আমরা সুলেমানকে আমাদের পরিচয় জানিয়ে সোনিয়াকে অনুরোধ করলাম সব বলার জন্য। সোনিয়া বর্তমানে শবনম তারপরের সব কথা জানালেন যা আমি সংক্ষেপে বলছি।

রোহন মারা যাবার পর সোহিনীর স্বশ্রুতালয়ে থাকা বেশিদিন সম্ভব হয়নি। কারণ মিঃ হেগডের পরিবার অত্যন্ত গৌড়া ব্রাহ্মণ সমাজের অন্তর্ভুক্ত ও অতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ওনাদের ধারণা সোনিয়া অপয়া এবং মৃত্যুর কারণ নাকি সো ওর নিশ্চয়ই বৈদব্যাযোগ ছিল যদিও ঠিকুজি কুষ্ঠি মিলিয়ে তাঁরা বিয়ে দিয়েছিলেন। এখন মিঃ ও মিসেস হেগডের মতে সোনিয়ার মা বাবা তার জন্মলগ্ন ঠিক দেয়নি। সোনিয়ার বাড়ি ছিল ব্যাঙ্গালোরে আর ও ইলেকট্রনিক্স গ্র্যাজুয়েশন ও এমবিএ করার পর ব্যাঙ্গালোরের হোয়াইট ফিল্ড ইনফোসিসে কাজ করত প্রাক বিবাহ জীবনে। বিয়ের পর ও কাজ করার অনুমতি পায়নি স্বশ্রুতবাড়ি থেকে। রোহনের মৃত্যুর খবর শুনে ওর প্রাক্তন সহকর্মী যে বর্তমানে ওর স্বামী দেখা করতে আসে ওর সঙ্গে। কিন্তু ওর স্বশ্রুতমশাই মুসলমান জেনে ওকে চুকতে দেয়নি ও পরে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে সোহিনীর সঙ্গে। প্রতিনিয়ত অসৌজন্যমূলক আচরণ, ওর রূপের প্রতি অভদ্র চারিত্রিক ইঙ্গিতে অতিষ্ঠ হয়ে ও নিজের বাপের বাড়ি ব্যাঙ্গালোরের গঙ্গনহাল্লিতে চলে যায় ও আবার ইনফোসিসে সুলেমানের সহায়তায় চাকরী পায়। সুলেমান ওকে অনেকভাবে সাহায্য করেছে ওর সমব্যথী হয়ে। সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে সোনিয়াকে মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখার ও নিজের পায়ে সাবলম্বী হওয়ার জন্য আগের মত। এর থেকেই ক্রমশ ভালবাসা ও বিবাহ সুলেমানের পরিবার আর নিজেও অনেক প্রগতিশীল সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় সংস্কারের বাইরে আর কোনও গৌড়ামি নেই। ওর মা বাবারও ওরই মত সর্বধর্মের প্রতি আস্থা আর ওদের বিবাহে সম্পূর্ণ ভালমনেই সম্মতি জানিয়ে খুব আদর করে ওকে নিয়ে এসেছেন। ওরা ওই সুয়োমেলিনারই বাসিন্দা গত ২০০ বছর ধরে। সুলেমানের ঠাকুর্দা ওখানে মিলিটারীতে গানার ছিলেন আর ওর বাবাও আর্মিতে কাজ করে রিটায়ার করেছেন। ওদের পরিবারের সবারই একটা করে বিবাহ। সোনিয়ার মা বাবারও ওদের বিয়েতে কোনও আপত্তি ছিল না। এই দোকানের পত্তন সুলেমানের ঠাকুর্দার আমলে। সোনিয়ার ধর্ম পরিবর্তনে ওর বর্তমান স্বামীর বা তার মা বাবার কোনও মত ছিল না। কিন্তু সোনিয়া তার জীবনে যা উপলব্ধি করেছে তাতে ওর মনে হয়েছে যে প্রচলিত ধর্মের বাইরেও কিছু মানুষ থাকে। যাদের কাছে মানবতাটাই ধর্ম। তাই ওদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকার প্রচেষ্টাতেই সে সোনিয়া থেকে শবনম হয়েছে কিন্তু ওর ঘরে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিও আছে। এত সমস্ত কথা হল আমাদের খাবার মাধ্যমে। ভারতের রাজনৈতিক ও দুর্নীতির অশান্তি তার সঙ্গে ধর্মীয় খুনোখুনি জেহাদের নামে, সুলেমানের ভারতে আর ভাল লাগছিল না। তাই নিজের শান্তিপূর্ণ দেশে চলে এসে ভাল চাকরী করেছে আর পৈত্রিক ব্যবসা দেখার জন্যে শবনমকে অনুরোধ করেছে। বেলা পড়ে গেছে এবার আমাদের যাবার পালা। ফেরী ঘাটে ফেরার জন্য তৈরি হলো।

শবনম বললেন ‘যে আপনাদের ফেরীঘাটে যেতে অনেক সময় লাগবে কারণ অনেক দূরে আমরা আছি। এখানে তো গাড়ি চলে না। তবে এখানে একটা রিক্সা আছে, মানে একটাই মাত্র। আমার জানা তাকেই ডাকি, সে দিয়ে আসবো’ আবার অবাক হলো। ফিনল্যান্ডেও রিক্সা চলে। শবনম কাউকে ফোন করল আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানকার মত তিন চাকার সাইকেল রিক্সা এসে হাজিরা। অতি আধুনিক আর উইলিয়াম নামে এক ভদ্রলোক সেটা চালায়। গাড়িতে প্যাডেল ও বিদ্যুৎ দুটোই চলে। গাড়ি চললেই ব্যাটারী চার্জ হয়। উইলিয়ামস নাকি নিজে তৈরি করেছে।

দুজনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ফেরার পথে পা বাড়ালো আর স্মৃতির মণিকোঠায় ভরে নিলাম আরও এক অনবদ্য কাহিনী।

\*গোপনীয়তা রক্ষার্থে চরিত্রদের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।



## ‘১৫ই আগস্ট ১৯৪৭’ – যেমন দেখেছি

ডঃ অমলেন্দু দত্ত, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ১৯৬৪

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট – ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা দিবসের প্রতিটি মুহূর্ত আমার দেহ মনে গভীর ভাবে দাগ কেটে বসে আছে। তার বড় কারণ আজ আমার পাশে আমার তখনকার অতিপ্রিয় আপন জনেরা মানে দিদি প্রতিমা দি বাবা দাদা মেজদা পাড়ার জেঠা কাকা ইত্যাদি কেউই জীবিত নেই। আমার তখন ঠিক পাঁচ বছর বয়স। স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতা কি সেটা উপলব্ধি করার বয়স আমার তখন হয়নি, কিন্তু তখনকার আসে পাশের সমস্ত মানুষ জনের মধ্যে স্বাধীনতা পাওয়ার যে স্বতঃস্ফূর্ত অনাবিল আনন্দ দেখেছিলাম তা ভোলবার নয়। আমার দিদি ও দিদির প্রাণপ্রতিম বন্ধু প্রতিমাদি তখন বসিরহাট হরিমোহন দালাল গার্লস স্কুলে ক্লাস সেভেন এ পড়ত। দিদি ওই দিন অনেক ভোরে উঠে কালিতলা থেকে বকুল ফুল কুড়িয়ে মালা গেঁথে রেখেছিল। তারপর স্নান করে সাদা লালপেড়ে সাড়ী পরে সেজে গুজে মাথার খোঁপায় বকুল ফুলের মালা পরে তৈরী হয়ে তারপর আমাকে ঘুম থেকে তুলে ফিটফাট করেছিল। ততক্ষণে প্রতিমাদি ও আমাদের বাড়ি এসে হাজির। একেবারে দিদির প্রতিচ্ছবি – ধপধপে সাদা লালপাড় সাড়ী, মাথার খোঁপায় বকুল ফুলের মালা, কপালে একটা ছোট্ট সাদা চন্দনের টিপ। কি সুন্দর লাগছিল ওদের দুজনকে। আমাদের বাড়ি থেকে হরিমোহন দালাল গার্লস স্কুল হেঁটে পাঁচ মিনিটের পথ। দিদি ও প্রতিমাদির সঙ্গে লাফাতে লাফাতে পৌঁছে গিয়েছিলাম ওদের স্কুলে।

ছোট্ট মেয়েরা সব সাদা ফ্রক, মাথায় লাল রঙের ফিতে আর গলায় নানা রঙের ফুলের মালা পরে যে যার নিজের খুসীমত নেচে বেড়াচ্ছিল চতুর্দিকে। ক্লাস নাইন টেনের মেয়েরা দিদিদের মত সাড়ী পরে আছে আর ওদের মধ্যে অনেকে বাড়ি থেকে শাঁখ এনে বাজিয়েই চলেছে। কয়েকজন মেয়ে দেশাত্মবোধক গান গাইছিল, দিদিও গিয়ে ওদের সঙ্গে গান গাইতে শুরু করল – আসলে দিদি খুব ভালো গান গাইতে পারত। বেশ কয়েকজন মেয়ে ভারতের জাতীয় পতাকা মাথার ওপর দোলাচ্ছিল। বাঁধাবন্ধুহারা অনাবিল আনন্দ ও খুসীর ঢেউ এ চারিদিক ভাসছিল। দিদিমণিরা বর্তমান এস এন মজুমদার রাস্তার ওপর সব মেয়েদের দুটি লাইনে দাঁড় করানো শুরু করলেন প্রথমে ছোট্ট মেয়েদের লাইন তারপর বড় মেয়েদের লাইন। আমি দিদি ও প্রতিমাদির মাঝখানে দুজনের হাত ধরে দাঁড়ালাম, দেখলাম বেশ কয়েকজন দিদিরা আমার মত তাদের ছোট ভাইদের নিয়ে এসেছে। দিদিমণিরা সবাই খানিকটা দূরে দূরে দুটি লাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন, আর তারপর ‘বন্দেমাতরম’ ও ‘জয়হিন্দ’ ধ্বনির মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হল। দিদি ও প্রতিমাদি অন্য মেয়েদের সঙ্গে গান গাইছিল। গান, শাঁখ, জয়ধ্বনি, নাচ আর উল্লাস সব মিলিয়ে সে কি অদ্ভুত পরিবেশ ও অনির্বচনীয় অনুভূতি। আমাদের মিছিল এস এন মজুমদার রোড দিয়ে গিয়ে ইটিন্ডাঘাট রোড ধরে বসিরহাট টাউনহলের পাশ দিয়ে জামরুলতলা হয়ে বসিরহাট পুরাতন বাজারের পরে একটা বাড়ির সামনে শেষ হয়েছিল। অনেক পরে জেনেছিলাম ওটা ছিল বসিরহাটের প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদ দীনেশ মজুমদারের পরিবারের বাড়ি। ওখানে বসিরহাটের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভারতবর্ষের কঠিন স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অসংখ্য বলিদানের কথা বললেন। সবাইকে নিজের নিজের কর্তব্যের কথা মনে করালেন আর বলেছিলেন সবাই মিলে মিশে একমন হয়ে কাজ করার কথা। এসব কথা অনেক পরে আমি প্রতিমা দিদির কাছে শুনেছিলাম। তবে এটা আমার ভালো মনে আছে যে আমাদের প্রত্যেককে একটা করে সিঁঙ্গারা ও রসগোল্লা দেওয়া হয়েছিল। তারপর দিদি, প্রতিমাদি ও অন্যান্য দিদিদের সঙ্গে আমরা খুব আনন্দ করতে করতে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম।

সন্ধ্যাবেলায় হয়েছিল বড়দের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু বলার আগে দেখি ১৯৪০ এর দশকের বসিরহাট কেমন ছিল। বসিরহাটে তখন ইলেকট্রিসিটি ছিল না। আর আমাদের গ্রাম সাঁইপালা ত বড় বড় গাছ আর বাঁশবাগানে ভর্তি ছিল। দিনের বেলাতেও সূর্যের দেখা পাওয়া যেত না কারণ বড় বড় গাছের ছায়ায় সব ঢাকা থাকত। কৃষ্ণ পক্ষের রাতে একেবারে শোচনীয় অবস্থা, চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মুষ্টিমেয় কয়েকটা মিউনিসিপ্যালিটির ল্যাম্পপোস্টে টিমটিম করে জলত কেরোসিন বা রেড়ির তেলের বাতি। সন্ধ্যাবেলায়

মিউনিসিপ্যালিটির লোক এসে মই লাগিয়ে ৬-৭ ফুট ওপরে ল্যাম্প গুলো জালিয়ে দিত। সেই আলোয় শুধু ল্যাম্পপোস্টের একেবারে কাছে জায়গাটাই দেখা যেত। যতদূর মনে পড়ে আমাদের বাড়ির কাছে সাঁইপালা গ্রামে ছিল মাত্র ৫টি ল্যাম্পপোস্ট – যদুনাথ বসু রোডে নয়না পুকুর পাড়ে বিশাল গাব গাছতলায় ১টি, সৈয়দ আহমেদ সাহেবের বাড়ির সামনে ১টি, এস এন মজুমদার রোডে চারুদালালের বাড়ির সামনে ১টি, মুন্সির বাগানের কাছে ১টি আর কবরখোলার কাছে ১টি। জেনে রাখা দরকার একমাত্র কলকাতা-ইটিন্ডাঘাট রোড ছিল পিচের রাস্তা এছাড়া বসিরহাট শহরের সব রাস্তাই ছিল চূণ সুড়কির অথবা মাটির রাস্তা। সাঁইপালা গ্রামের পাশ দিয়ে ছিল মারটিন কোম্পানির মিটার গেজ ছোট ট্রেন লাইন। বসিরহাট স্টেশনটা ছিল কাছারীপাড়ায় আমাদের প্রাথমিক পাঠশালার কাছের তেঁতুল তলায়। শহরের মধ্যে একমাত্র কলকাতা-ইটিন্ডাঘাট রাস্তাটাই ছিল দোকান বাজার চকমেলানো বাড়ি ঘরদোরে একেবারে জমজমাট।

সক্কেবেলায় বড়দের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের একটা বড় অঙ্গ হয়েছিল গরুর গাড়ির মিছিল। পুরুষ মহিলারা সবাই সুন্দর কাচা পোষাক পরে পতাকা নিয়ে লাইন করে নতুন ভারতবর্ষের জয়ধ্বনি করতে করতে গরুর গাড়িগুলোর আগে পিছনে এগিয়ে চলল। পাড়ার মেয়েরা দেশাত্মবোধক গান গাইতে লাগল। আমরা খুব ছোটরা অত হাঁটতে পারব না বলে গরুর গাড়িতে বসবার অধিকার পেয়েছিলাম। কিন্তু হাজারক গুলোকে গরুর গাড়িতে ধরে বসার দায়িত্ব ও ছিল আমাদের। চলন্ত গরুর গাড়িতে হাজারক ধরে রাখা যে কি কঠিন, সেটা মনে করলে এখন ও আমার ভয় করে। পাড়ার শিশু কাকা বোধ হয় আমাদের কষ্টটা বুঝতে পারছিলেন, তাই উনি ই হাজারক গুলোকে বড়দের সবার হাতে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন আর আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। জানিনা কেন এত আনন্দের মধ্যেও কিন্তু একটা চাপা ত্রাস ও থমথমে ভাব ছিল বড়দের চোখে মুখে। মনে আছে আমাদের বড়দের অনেকের কাছে লাঠিসোঁটা দেখেছিলাম। পুরো সাঁইপালা গ্রাম ঘুরে আর টাকি রাস্তা দিয়ে গিয়ে জিরাকপুর ঘুরে মুসলমান পাড়ার মধ্যে দিয়ে এসে চারু দালালের বাড়ির সামনে বর্তমান সুধীর মজুমদার রোডে আমাদের মিছিলের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন শেষ হয়েছিল। তারপর কালিতলায় নিয়ে গিয়ে সবাইকে লুচি আলুরদম ও রসগোল্লা খাওয়ানো হয়েছিল। অদ্ভুত কি এক অজানা আনন্দে আমি মনে প্রাণে খুশিতে ভরে উঠেছিলাম। স্বাধীনতার এত নিছক আনন্দ সত্ত্বেও এখন মনটা খুব ই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে কারণ এর ঠিক দুবছর পরেই ক্লাস নাইনে পড়ার সময় আমার প্রিয় দিদি আমাদের ছেড়ে অনন্তলোকে চলে গিয়েছিল। প্রতিমা দিদি বিয়ে থা না করে সারাজীবন আমাদের দিদি হয়েই কাটিয়ে গেল, দুবছর আগে প্রতিমা দিদি ও নিজের প্রিয় বন্ধুর কাছে চলে গিয়েছে। ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালের সেই আবেগপ্রবণ দিনটির উচ্ছসিত মানুষগুলো মানে গ্রামের রাঙাদা, রাজকুমার মেশো, শৈলেন জ্যাঠা, দাশুকাকা, হাজুকাকা, শচীকাকা, কান্তিদা, কালি কাকা, চারু কাকা, হিরন দা, গৌর দা, চিনু দা, রাণী পিসি, ছবিদি, হেনা পিসি, আমার দাদা বাবা মা পিসি, মেজ কাকিমা ইত্যাদি আর কেউই আমাদের মধ্যে নেই।

“স্মৃতি ভারে আমি পড়ে আছি ভারমুক্ত কেউ এখানে নেই।”

## এক অমূল্য স্মৃতিসঞ্চয়

ডঃ অমলেন্দু দত্ত, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ১৯৬৪

১৯৮২ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লীর ইজনীয়ারস ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে একটা ইউনেস্কো ফেলোসিপ পেয়ে ইউনিভার্সিটি ওফ ম্যাসাচুসেটস এ ৬ মাসের রিসার্চ এর জন্য আমেরিকায় গিয়েছিলাম বৌ মজু আর ৫ বছরের ছেলে ভাস্করকে নিয়ে।

৬ মাসে অনেক নতুন বন্ধু হল, অনেক ঘুরলাম, আর রিসার্চের কাজ ও ভালোই হল। স্বাভাবিক ভাবেই দেশের আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের জন্যে কেনাকাটাও প্রাণখুলেই করলাম। সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্ক থেকে ফেরার সময় আবিষ্কার করলাম আমাদের বড় স্যুটকেস গুলো এয়ারওয়েস নির্ধারিত সংখ্যা ও ওজন সীমার মধ্যে যদিওবা কোনোক্রমে ব্যবস্থা হয়, কিন্তু আমাদের হ্যান্ডব্যাগ নির্ধারিতের ওপর দুটো বেশী হবেই। ওখানকার কয়েকজন বলল সেরকম অবস্থা হলে এয়ারপোর্টেই অনেকগুলো ড্রেস পরে নিতে, তাহলে ব্যাগ কমে যাবে। যাইহোক চেক ইন করার লাইনে দাড়িয়ে মজু আমায় দেখালো যে আমাদের খানিকটি সামনে বেশ কয়েকজন হ্যান্ডব্যাগ ছাড়া খালি হাতে লাইনে দাড়িয়ে। সময় নষ্ট না করে মজু সামনে গিয়ে একজন ভদ্রলোক ও মহিলাকে আমাদের ব্যাপারসাপার বলে অনুরোধ করল যদি ওনারা আমাদের দুটো ব্যাগ নিয়ে নেন। দুজনে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে দুটো ব্যাগ নিয়ে নিলেন। আমি ভাস্করের হাত ধরে ওনারে ধন্যবাদ জানাতে সামনে গিয়ে ভদ্রলোকের মুখটা দেখে লজ্জায় জড়সড় অভিভূত হয়ে গেলাম। সামনে দাড়িয়ে আছেন আমাদের পরমপ্রিয় সঙ্গীত সম্রাট মান্না দে আর ওনার স্ত্রী সুলোচনা দেবী। মান্না দে বললেন, ‘কি যে করোনা তোমরা, এই ছোট্ট ছেলেটার ঘাড়ো একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে দিয়েছ?’ সঙ্গে একজনকে ব্যাগটা দিলেন আর বললেন প্লেনে উঠে ব্যাগগুলো নিয়ে নিতো জেনেছিলাম সঙ্গীতগুরু মান্না দে একটা বড় দল নিয়ে আমেরিকায় বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করতে এসেছিলেন। এতবড় উঁচু মাপের একজন মানুষের পক্ষে এইরকম ‘মুকিল আসান’ হয়ে নিছক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া আমাদের মনকে গভীরভাবে ছুয়ে গিয়েছিল। অনেক বারও ওঁনাকে প্রণাম করে ধন্য হয়েছিলাম। এটা আমাদের জীবনের এক অমূল্য স্মৃতি সঞ্চয়।



# Down the memory lane – Arab land Iraq

*Partha Sarathi Mandal, Civil Engineering, 1969*

**Preamble:** Why did I choose Iraq from the encyclopedia of my long memories of seventy-three years? Honestly, I don't really know. Maybe it influenced my life during the early phase of my career. Maybe it was my fascination with a foreign country. Maybe it captured my imagination because it was a mystic desert country in the Middle East. Or is it due to the fall of the wealthy Mesopotamian civilization and its dynamic transformation to contemporary era? Or is it due to the desertification of a wealthy fertile land and the phenomenal aggressive exploitation of nature and environment? Or is it because of the technology challenge that prevented the reversal of the desert to fertile agricultural land? Or is it due to my foreign assignment deputation as Civil Engineering Expert by the Government of Iraq for the pilot project meant to meet the challenge? Or is it because of the attraction of the foreign assignment which came with an attractive package and the opportunity of foreign travel? I experienced the distinct Islamic progressive and liberal culture of Iraq. I have also seen how they were enormously proud of their country and the strong economy. This article is really a compilation of some anecdotes of my life experienced along with my family during our four years in Iraq about 40 years ago in the backdrop of the long Iraq-Iran war. How did our Indian friends behave there? How did we interact with other friends and colleagues from Iraq, Egypt, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Yugoslavia, etc.? This is a non-political article without any prejudice based on socio-cultural and professional interactions.

**Mission Iraq:** Iraq is like a mini India. The country traditionally had friendly relations with India. The topography can be divided into five physiographic regions: (i) Alluvial plains of central and south-eastern peninsular; (ii) Doab upland between the Tigris and the Euphrates rivers in the north; (iii) Deserts in the west and south; (iv) Highland mountains in the northeast; and (v) Lower Mesopotamia marshy coastal region joining the Persian Gulf. Iraq was an economically strong and oil-rich country. Development was moderate and compatible to the people's need.

**Fakeer-a-Hind:** It was observed that some Iraqis had the perception that Indians were 'fakeers' (poor) and 'thieves'. India practically had no honourable position there. But Indira Gandhi, the then Prime Minister of India, earned very high prestige and honor. Because of such circumstances we rediscovered our pride as Indians while representing our country in a foreign nation. I had not questioned my pride in my country earlier as it was so obvious as holding our country in the highest esteem should be the first sign of our patriotism.

**Andaman Link:** The Iraq mission was initiated while I was posted in the Andamans. It was my first posting as an employee of the Central Water Commission (CWC) in 1971. It was a wonderful adventurous life in the beautiful virgin islands of Andaman & Nicobar; but that is another story. My job as a CWC employee was to explore and investigate the rivers and mountains of some of the islands to assess the water resources for hydropower and irrigation to boost the local economy and bring about development. One day in 1975, I was in my Subdivision office at Nimbudera, Middle Andaman. I was finishing up all the pending mails and files when I came across a circular from the External Ministry asking applications for the empanelment of engineers for foreign assignments to meet the requirements of other countries. I half-heartedly applied without expecting any offer. But luckily the fruit of the Iraq mission ripened after about 3-4 years in 1978-79. However, by this time I had left the Andamans after a stay of about five and half years, in 1976, as I was transferred to our Head Office in New Delhi.

**Jadavpur Link:** Nirmal De was my classmate at Jadavpur University. He was my office colleague as well in the CWC but later immigrated to the USA. He happened to be one of the catalysts for my Iraq assignment. One day in 1978, we met in our office corridor. He told me that he had seen my name on the interview call list at the Iraqi Embassy and advised me to appear for the interview immediately as the next day would be the last date to do so.

I reached the embassy next day. After a detailed interview, I was selected for the post. My appointment letter was issued on the spot and the agreement was signed. I then reported to the External Ministry for verification and clearance. But, to my surprise, the Ministry informed me that my salary was going to be 25% less than what had been agreed upon at the time I had signed the agreement. I immediately requested the Ministry to stop processing my case as I felt that the deal had been fraudulent and I did not want to go to another country under such suspicious circumstances. Accordingly, I did not pursue this posting any further.

After about a year, I suddenly received a phone call from the Iraq Embassy and was requested to visit the embassy to review the last agreement and the salary. Next morning, I reported to the embassy. Mr Rahim, GM & HOD (Project) was waiting for me. He then revised the salary and signed a fresh agreement. Our External Ministry agreed and processed my case and issued all clearances and directed the office to relieve me urgently in order to honor the bilateral protocol between India and Iraq.

**Before the journey:** Once my deputation in Iraq was finalized, everybody advised me to go alone and suggested that my family follow me after our residence and other facilities had been finalized. My son was then only a little over 2. I was in two minds about taking my young family with me. I considered all pros and cons from all angles including the problems to be faced in Delhi and Iraq. Then I decided to take my family along and face the consequences together.

**Ladies Forbidden:** We reached Baghdad. I was surprised that there was no escort at the airport as promised by my office. I came across one person from the Indian Embassy. He contacted the Project Authority. He also arranged for a taxi and directed us to a designated hotel in downtown Baghdad. I was surprised to learn that women were not allowed to stay in hotels without permission, which was arranged by the competent authority. After completing the hotel formalities, we occupied a shabby room on the third floor without attached toilet and unfortunately found that the common bathrooms and WCs were intolerably dirty.

**Mission Milk:** We went out for a market survey. Arabic name of milk was not known to us. One gentleman approached me to help. I tried all innovative words but failed. I took a paper and drew a cow. Eureka! He then jumped with joy and dragged me to a shop and showed me a can of Nido powdered milk. I felt relieved.

**Mission Rice:** Our next mission was to find rice for dinner. Markets and restaurant would close by 7.30 pm. We occupied a table in a restaurant. I wanted to order a rice meal. But we did not know the Arabic word for rice. I went to the kitchen, but could not find rice. There were Samoon (like our long bun) and khubz like our tandoori roti, Rajma soup and meat. That is what we had for our first dinner.

But, we did not abandon mission rice. Next day we wanted to find an Indian who might help us. It was a hot summer day. We thought that bangles and sindoor my wife was wearing might help to identify us as Indians. This time it worked. After some time, a young Bangladeshi man, Abdulla, came to us and asked if we were from Bangladesh. Our mission was successful. We greeted him and introduced each other with warm smiles. He invited us to his residence which was about 10 minutes' walk for a dinner. We immediately accepted the invitation and had a nice rice dinner. We learnt from him that the Arabic for rice is 'timmin'. It was a remarkable day for us. His hospitality was warm and cordial. Unfortunately, we never met him again. Maybe our paths shall cross again in future.

We continued to stay at the same Baghdad hotel for about a week. We had no difficulty in getting milk or rice anymore. During this one-week stay in Baghdad, we completed some formalities with the Ministry. Then the competent authority directed us to proceed to Dujailah to report to the project authority. We ultimately reported to Mr Rahim, HOD & GM. There was no accommodation for us at the project area as it was a remote location. A hotel was arranged with requisite permission for my wife at the Al Kut town. The project office was 65 km away from the hotel. We had no option but to stay there for about 15 days. A Sri Lankan man helped us in this hotel. He was bachelor. He used to cook his own food at the half landing of the staircase. When he observed our embarrassment in going to the restaurant for food, he offered his gas burner for our cooking. We shall never forget him and his kindness.

**State Capital Al Kut:** It was a small state capital town in central Iraq. We were searching for rented accommodation. The 'HORA' colony was a favorite for the people of Indian subcontinent. The colony was developed with plotted low-rise buildings. All houses had 4-5 big rooms to accommodate big families. Even the kitchens were very big. But there was only one big bathroom and one small WC for such a big house. I was astonished and wondered how Iraqi designers used to design the sanitary system. How can it be so poor? Both bathroom and WC got choked frequently causing foul smell all times.

**Mission House:** We were desperately searching for accommodation. But none of the Indians we met helped us. There were quite a few Indians including the eleven Indian families, in our project itself. Astonishingly nobody came forward to help us. One day Mr Sharma from Delhi met me. He was staying alone as his family had gone back to India in advance while he was completing the formalities for his final repatriation. He wanted us to take his house on adjustment. I felt that he was exploiting us for his vested interest without a thought for our suffering

at the hotel. He was trying to convince me not to take any other house. He could have easily accommodated us in his empty house, but he did not do so. Seeing our condition, a Bangladeshi gentleman offered to let us stay at his house as guests. Hearing this, Mr Sharma requested us to shift into his house immediately. Mr Nath, a Bangladeshi Senior Engineer from Dhaka, was also searching for a house at this time. We both decided to share the same house. We were able to move into the house after about two weeks stay in the hotel.

**Iraq-Iran War:** When we first landed in Iraq in 1978, Ahmed Hassan Al-Bakr was the President and Saddam Hussein was the Vice President of the secular Ba'ath Party led government, though Saddam was stronger politically and more popular. Subsequently Saddam became the President in July 1979 after the resignation of Al-Bakr on health grounds and he subsequently died in 1982. The Iraq-Iran war began when Iraq invaded Iran in September 1980 and it was 1988 by the time the war ended. This war was the outcome of various broad geopolitical issues caused by Shi'a and Sunni conflicts as Iran is dominated by Shi'ites and Iraq is a Sunni-majority country. There was wild speculation regarding the causes of war with even personal enmity between the two heads of states being thought of as one reason.

Let me present the character of the war on the basis of my perceptions. It reminded me of the Kurukshetra war of the Mahabharata. In that war, there was a war code: everyday the sound of the bugle at the sunrise and sunset used to declare the opening and the closing of the daily battle. Similarly, in the Iraq-Iran war, the fighting was practically limited between dawn and dusk. This was perhaps because both sides had limited stock of modern arms and ammunitions which could be sustained for a week or so. This would be followed by 3-4 days when both sides were busy procuring arms and ammunition. So, we could almost predict when the next round of fighting might start.

All adult Iraqis were trained in the use of arms and ammunition. Everybody was equipped with weapons for their self-defense and to fight in case of any state emergency. They always remained ready to go to the war front whenever they might be called. We noticed that our Iraqi office colleagues and staff used to go to the war front in rotation for about a week or two at a time. Their return was not certain and we lost some of them.

**Fighter Plane:** We encountered tough times as the war went on. Al Kut was one of the main targets of Iran and saw heavy bombardment. There were strategically important economic locations in Al Kut such as the Barrage, the National Textile Factory, government buildings, government education centres, townships and other economic infrastructures. There was even a nuclear research facility nearby. Our residence was in the danger of being a casualty as it was in the vicinity of these targets, which Iran was bombarding in order to destroy. Powerful fighter planes bombarded the town and destroyed some buildings. They used to fly low at high speed with a loud roaring sound that would cause residential buildings to vibrate. Several glass windowpanes cracked. As per the war guidelines, at such times we used to take shelter behind the corner of a door for more safety.

**Victory Celebration:** Winning and losing battles were two-way phenomena in Iraq and Iran. But who won the war? In our colony people used to celebrate a battle win in a spectacular way. All the people would come out in the evening with their machine guns, revolvers and rifles and start joy-firing in the air. The first day we were so scared that we thought Iranian soldiers had attacked our colony. It was only later that we understood that it was a celebration for winning the day's battle.

**Fair Price Market:** When war was declared and fighting commenced, we thought that it might last for few days only. But we predicted that there would be scarcity in the market. So we started purchasing some essential rations for a month's requirement as market prices could soar up. To our surprise, instead of scarcity, the market was flooded with all types of commodities at lower prices. The Iraq administration was very strict in this regard. The price of any commodity, be it of perishables such as vegetables and fruits or non-perishable items such as TVs or ACs, would be fixed throughout the country irrespective of whether they were sold at posh areas of the capital city of Baghdad or at the remotest village shop. Nobody was allowed to sell any item even at a reduced rate. The whole country was basically now filled with fair price shops, and there was no price variation at all. As a result, there was no need to bargain, and hence time wasted in bargaining was minimum. One day I was purchasing potatoes from a poor vegetable vendor in the market. I had finished my purchase when suddenly two men in civil dress appeared, caught hold of the vendor and asked him why he was selling potatoes at a higher rate. It was perhaps only 10 paise higher than the government-fixed price and the hike was really quite insignificant. The vendor was arrested. The authorities wanted me to become a witness against the vendor but

ignored me due language problem. An Egyptian was picked up as a witness. The vendor, horrified and miserable, began pleading for mercy but to no avail. I felt very sorry for him as I knew that punishment would be severe.

**Mini India:** We were eleven Indian engineers working together in the same Dujailah Major Irrigation and Drainage Project. Some of us were staying in the 'Hora' colony and others were staying in Al Zahara. We were a diverse cultural group and formed a sort of mini India covering Andhra Pradesh, Bihar, Himachal Pradesh, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttaranchal, and West Bengal. Mr Verma was a forced bachelor from Bihar as he was staying without his family. He was father of six children and a very interesting person. Everybody used to like him and enjoyed his company due to his humorous, simple and cordial nature. When I look back I see that we were very happy there.

**Cultural Activities:** We used to have family get-togethers by rotation and these parties had lavish menus of homemade food. All the other ladies used to help the host family. We used to perform and enjoy cultural programmes and there were singers, mime artists, skit players, and others. At our house, we used our ground floor veranda facing the front lawn as the stage. One day Vermaji said that he would write a script for a play which would be performed by ladies, children and the gentlemen. Everyone agreed enthusiastically and the day of the performance became like a festival for us.

**Republic Day of India:** Once we decided that we should celebrate the Republic Day of India. However, some of us had the apprehension that it might attract trouble and raise political issues leading to police action from the Iraqi administration. We also did not have the Indian national flag. So, we decided to celebrate without the flag hoisting ceremony. We all celebrated by singing the national anthem and a few patriotic slogans were also raised. This was followed sports and games for the families and there were prizes too. We also had snacks and food as no festival is complete without them. So, we all enjoyed the day and it was a historic occasion for the Indians present in Iraq at that time.

**Tourism:** One day we thought of requesting our office to arrange a family group tour to the land of mountains and waterfalls at Mosul in North Iraq. The Project authority sponsored our seven-day tour by providing transportation and resort accommodation. We left Al Kut early in the morning as Mosul was about 500 km away. The highways in Iraq were of international standard and boasted of excellent maintenance. Even buses used to run at a speed of 150 km/hr smoothly. Not even a single pothole could be seen over hundreds of kilometres and road discipline was high. However, hill roads were narrow like the hill roads in Himachal Pradesh. But the quality of roads used to be a class ahead. We were enjoying the sightseeing on both sides of the road. The cross-country journey exposed us to various different parts of the country. Although the desert land had its own character and beauty, one can get quickly bored of seeing long stretches of grey and dry land spotted with desert plants. Some of us who were luckier could see some desert animals such various birds, lizards, rabbits, foxes, wild boars, etc. We noticed that villages in the deserts, mountains, and semi-urban areas had distinct characteristics. For example, in hot paces, villages were clusters of about 10-20 mud houses, where, to beat the heat, the roofs were covered with mud. Some villages had houses with hanging kitchen gardens.

**Tea Tumbler:** We reached a tourist spot in the afternoon. The spot was surrounded by narrow gorges of steep mountains. A natural stream flowed down the hills. On the vicinity were a few small waterfalls calling out to people to show off its sprinkling rapids. We were roaming around and enjoying the natural beauty. We saw a family sitting on a carpet spread over a rocky terrace. There was also a small local tea shop. Hot tea was brewing non-stop on an antique traditional tea brewer. People were enjoying gossip along with snacks and tea. Here it must be mentioned that Iraqis traditionally drank tea using a 'Dumroo', which is like a small glass tumbler of 2 x 1.5 inches that rested on a saucer. Tea was poured in the dumroo half filled with sugar powder.

**Saddam Hussain:** While on our tour, at one place, we came to know that Saddam Hussain would be visiting soon. A strong security network was in place and there were hundreds of armed military persons guarding the place from all sides and guards were stationed even on high hills. Ignoring the security belt, I started taking photos with cheap point and click camera as army personnel were not objecting to photography. After an hour or so, we noticed that the security persons had become very alert. Tourists also became excited as we realized that the honorable President of Iraq, Saddam Hussain, was arriving. I happily took position among the others with my camera ready. Security persons warned me not to take photos. But I was determined to take a photo of Saddam by any means possible. Suddenly, everyone lined up on the street to receive and greet their great leader. We were eagerly waiting when suddenly Saddam Hussain arrived. A roar of loud greetings rose to the air. We could see that Saddam was very popular. He greeted all by waving hands and shaking hands with people in the

crowd. When he came near me I managed to secretly take a photo by risking my life. He happened to come very near to me, and even shook my hands greeting me by saying “Marhaba [welcome] Al-Hind”. I replied with “Ahlan wa Sahlan”. Perhaps he had understood that I was an Indian.

Saddam was a popular leader of the common people. After taking over as President of Iraq, he toured the country and visited the people. He was known to suddenly stop on the highway on his way to a place and pay a surprise visit to nearby villages and meet the villagers. Wherever he observed that some villagers did not have TVs and some did not have refrigerators, he ordered the officers to provide these amenities. The next day these villagers would receive these gadgets. Iraqi people had a very traditional way of welcoming and greeting a VIP. In honor of the chief guest, they would sacrifice a sheep in front of the guest, start roasting the whole sheep on the fire and offer the delicacy to the guest. The guest had to stay till the entire ritual was over. So, Saddam also would stay with them happily till the traditional protocol of the meal was over. The farewell of the chief guest would be complete with joy-firing. The chief guest was not supposed to go in the middle of the event. Such was his way of dealing with the people in return to their love and respect.

One day in Baghdad, he was going somewhere when he suddenly stopped in front of a hospital. He enquired about the attendance of all doctors and found that one doctor on duty was not available. He then ordered the administration to terminate him from service and also ordered the cancellation of his registration. This was served to give the entire medical fraternity a warning and others were also given a signal that they had to be dutiful and punctual or face the consequences. Such was his authority.

**Project:** Let us get back to my work in the project. We found that the land was saline and unfit for even fodder cultivation. Iraqis are non-vegetarians and consumption of meat was high. Therefore, demand of animal fodder was also high. The project I was involved in was for the construction of an irrigation and drainage system to convert desert land to fertile agricultural land to grow animal fodder. Constructions of drainage and canal networks along with other civil structures was the main features of the project. The main canal to be built was from the Al Kut Barrage which was about 65 km from the project. The topography was very flat gradient, and pressure head was very low and critical. Evaporation loss factor was unusually high. So the project was designed with many technical constraints in mind. To reduce head loss and evaporation, the branch canals were lined canals and distribution system were in the form of AC pipes with concrete intake and outlet structures along with hydrant valves that were laid with precious levels. Flooding for leaching of the land was the main technical phenomenon for desalinisation of the soil. Leaching would dissolve the salt and drain it underground through perforated drainage pipes with filters. It was expected that the land would be fit for agriculture after three years of this desalination process. A Yugoslavian Company was the EPC contractor for this and the construction methodology was of latest available high technology. By then India had not adopted such costly technology for reversing of desertification. We eleven Indian engineers were the sole supervising authority on behalf of the Iraq government. We used to travel about 200 km daily in the hot sun protecting ourselves from temperatures of 50 degree Centigrade using typical Arabic headgear.

**Mission Mushroom:** Mushrooms naturally grew under the wet desert soil after the initial seasonal rainfall. These mushrooms were available in our project command area and we harvested mushrooms regularly.

**Yugoslavian Colony:** At this time the Iran-Iraq war was going on in full swing. The Iraqi authorities arranged for permanent concrete quarters for us near the project area and shifted us from Al Kut for safety. We were facing inconvenience there as the facilities were not good. We wanted to go back.

There was a Yugoslavian residential colony nearby with temporary caravan type wooden AC houses with full facilities. By that time, the Yugoslavian authorities had decided to compulsorily send back all female staff, families and children to their own country for safety. As a result some of the houses became vacant. The Iraqi authorities offered to shift us to this Yugoslavian residential colony for better accommodation and greater safety as there was no fear of warfare here. They requested the Yugoslavian authorities to accommodate us all in the vacant quarters. Thankfully, they obliged. Thereafter we were more comfortable and safe. Although the Yugoslavian company offered us free food from their canteen, we settled to pay. So, we shared their canteen partially and side by side we cooked ourselves also.

**Khilona Uncle:** A Yugoslavian man became very friendly and loving towards our son. My son gave him nickname ‘Khilona (Toy) Uncle’. He used to take my son to visit him for some time. In fact my son resembled his son. His son had plenty of toys but those had become useless as his family had gone back. He used to give a

piece of toy to my son daily from his stock. Over the time he might have gifted him at least 200 expensive toys. Normally he used to avoid feeding our son snacks. But in case he gave my son some food, he used to tell us about it even mentioning the quantity to avoid subsequent overfeeding at home.

**Hunting of Wild Boar:** Some Yugoslavians would at times hunt wild boar from the adjacent desert areas. In the evening they used to roast the boar over a camp fire for a feast. After the night meal with them, my son returned and told us that he had eaten a dog. He had never seen a boar before. But the tragedy occurred with 3-year-old Geeta, the daughter of Mr Rao. The Raos were religiously vegetarian. But Geeta had also ate boar meat with the Yugoslavians. The Yugoslavians were not at all aware about the seriousness of vegetarianism. The next day, Mrs Rao came to our quarter. Geeta had told her that she had eaten some strange food. So she asked my wife about it and we innocently told her that it might be wild boar as our son had eaten the same thing and which had also been confirmed by the Khilona (Toy) Uncle. Mrs Rao could not believe what she was hearing. She started accusing us that we were lying. She wailed that Geeta's marriage prospects would be at risk if she had eaten meat. We were amazed to hear her worry about her daughter's marriage, when the child was merely 3 years old. We wanted to console her and requested her to forget the issue. We told her that time would take care of everything. But she took great offence regarding the matter. Since that day Geeta was not even allowed to play outside. She was strictly forbidden from eating anything outside her home. Even other Indians were forbidden to offer her any food.

**Conclusion:** Our stay in Iraq was a wonderful experience. We can happily say that our circumstances motivated is to participate in socio-cultural activities even while in worrisome situations. This gave us the patriotic feeling for the first time when we felt proud to be Indians in a foreign land. It taught us to adapt to extreme situations as we learnt to work even in 50°C temperature in the hot desert. Our time in Iraq gave us the satisfaction of achieving professional excellence. Getting to closely observe the historical Iraq-Iran war was a one in a lifetime experience for us. We found that differing language and religion were not barriers to dynamism and progress. We were witness to the process of the historical transformation of modern country of Iraq, which had developed from the Mesopotamian civilization' into the post-war country of the contemporary era. We realized that human endeavors always triumph.

**With Best Compliments from:**

**All the engineers working  
with Simplex 2x800 MW Stage 1,  
Alstom - Telengana Project (C3141)**

## বান্না-বান্না

জয়ন্তী চক্রবর্তী\*

৪-৫ জনকে পরিবেশনের জন্য দুটি রেসিপি দেয়া হল।

### শাহী কপি

#### উপকরণ

ফুলকপি – ১ (বড়ো); টক দই – ১৫০ গ্রাঃ; কাজু বাদাম বাটা – ২ বড় চা চামচ; চারমগজ বাটা – ১ বড় চা চামচ; এলাচ – ৬; লবঙ্গ – ৬; দারুচিনি – ২; জায়িত্রি, জায়াফল – অল্প; শাহ মরিচ – ১ চা চামচ (গুড়ো); সরষে তেল – ২০০ গ্রাঃ; নুন ও মিষ্টি আন্দাজ মতো

#### প্রণালী

প্রথমে শুকনো খোলায় গরম মশলাগুলি নিয়ে ভালো করে নেড়ে নেবেন। হাল্কা গন্ধ বেরোলে তুলে গুড়ো করে রাখুন। তেল গরম হলে কপিগুলো ভালো করে ভেজে তুলে রাখুন। তারপর তেলে আদা বাটা, কাজু ও চারমগজ বাটা, নুন, মিষ্টি, গুড়ো করা শাহ মরিচ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেবেন। ভালো করে কষানো হলে ফেটিয়ে রাখা টক দই দিয়ে দেবেন। তেলে ছেড়ে ভেজে রাখা কপিগুলো দিয়ে দেবেন। ভালো করে মিশিয়ে অল্প জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেবেন। কপি সেদ্ধ হয়ে এলে গুড়ো গরমমশলা ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

### পেপে চিংড়ি ঘন্ট

#### উপকরণ

কাঁচা পেপে – ৫০০ গ্রাঃ; আলু – ১ (বড়ো); ছোটো চিংড়ি – ২৫০ গ্রাঃ; গোটা জিরে – ১/২ চা চামচ; আদা বাটা – ২ চা চামচ; জিরে গুড়ো – ২ চা চামচ; হলুদ গুড়ো – ১ চা চামচ; এলাচ – ৪; লবঙ্গ – ৪; দারুচিনি – ১; তেজপাতা – ২; ঘি – ২ চা চামচ; সরষে তেল – ৫ বড় চা চামচ; নুন ও চিনি – আন্দাজ মতো

#### প্রণালী

পেপে গ্রেট করে নিতে হবে। আলুগুলি ছোট আকারে কেটে ভেজে রাখুন। চিংড়ি নুন হলুদ মাখিয়ে ভেজে রাখুন। তেলে তেজপাতা ও গোটা জিরে ফোড়ন দিয়ে গ্রেট করে রাখা পেপেগুলো দিয়ে দেবেন। পেপে ভাজা ভাজা হয়ে আসলে তাতে জিরে গুড়ো, হলুদ গুড়ো, আদা বাটা, নুন ও মিষ্টি দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেবেন। এরপর ভাজা আলু ও চিংড়ি দিয়ে কষিয়ে নিন। তেল ছাড়লে পরিমান মতো জল দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। জল শুকিয়ে মাখা মাখা হলে ঘি, গরম মশলা ও কাঁচা লঙ্কা দিয়ে নামিয়ে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

\* শুভাশিস চক্রবর্তীর (কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ২০০৬) মা



# Cyclone resistant architecture for traditional and non-engineered buildings

*Alok Sankar Dasgupta, Architecture, 1979*

The horrific destruction caused by Super Cyclone Amphan is still fresh in our minds. It had, among others, completely destroyed and severely damaged lakhs and lakhs of buildings.

The destructions prompted me to prepare this article as a humble way of trying to help our countrymen. Keeping in mind the rich indigenous knowledge and construction experience locally available, I have put together some scientifically developed and tested design and construction guidelines that can help in making building resistant to the forces of strong winds. These designs have been developed by top scientists from premier institutions like IIT Roorkee, IIT Madras, BMPTC, Govt. of India etc. The design guides offered here are simple and easy to understand. These should help the affected population to rebuild their homes better and stronger. If translated into Bengali, it is expected to be more helpful.

These guidelines are provided for non-engineered buildings meaning buildings which are spontaneously and informally constructed by the local people in the traditional way without any or little intervention by qualified architects and engineers. The guidelines are provided in two parts: a. Design and b. Construction.

## DESIGN INTERVENTION:

### 1. Site Selection:

Wherever possible, advantages of natural protection must be taken to site buildings and structures. For example, the area behind a mound should be preferred to provide for natural shielding.



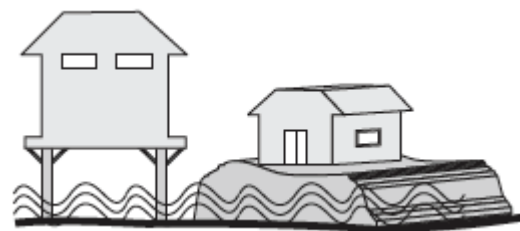
Sketch 1: Buildings protected by hillocks



Similarly, a row of common trees planted upwind will act as a shield. The influence of such a shield usually depends on the distance between the trees and the building which is generally between 8 to 10 times the height of the trees.

Sketch 2: Building protected by trees

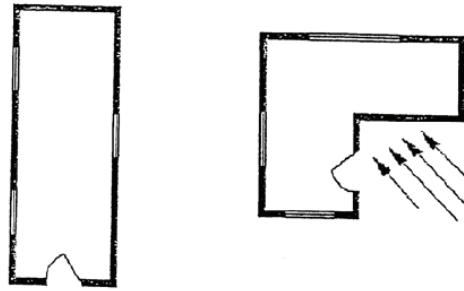
Cyclonic wind generates storm tides. Cyclones also bring in heavy rains. In regions close to the coast, a site above the likely flood-level should be preferred. In case of non-availability of high natural ground, buildings can be constructed over raised earthen mounds. Buildings can also be constructed on stilts with no masonry or bracings up to maximum surge level.



Sketch 3: Building on raised earthen mounds or on stilts

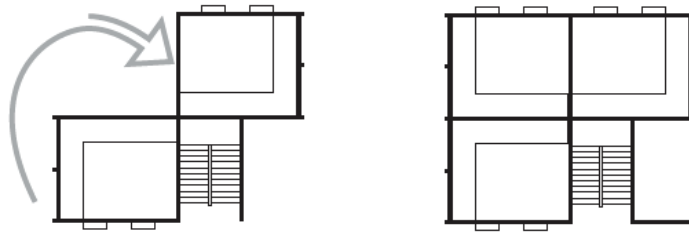
## 1. Plan-forms & Orientation:

From the point of functional efficiency, a square or rectangular building plan is preferred. Where most prevalent wind direction is known, the building should be so oriented that its smallest facade faces the wind.



Sketch 4: Long, Narrow or L-Shaped building plans are not preferred

A symmetrical building with a compact plan is more stable than an asymmetrical building having empty pockets as the latter is more prone to damages.



Sketch 5a: Asymmetrical building not Preferred

Sketch 5b: Compact form Preferred

In case of designing a group of buildings, the cluster arrangement may be followed instead of row type. Row type housing can increase wind speed by tunnel effect.



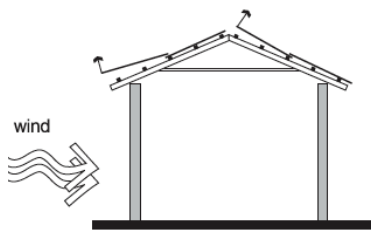
Sketch 6a: Cluster Plan: Preferred



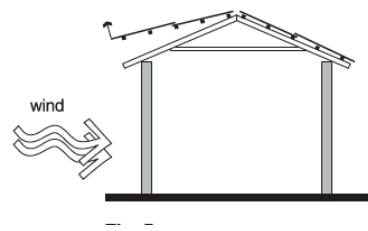
Sketch 6b: Row Type Plan: Not Preferred

## Roof Architecture:

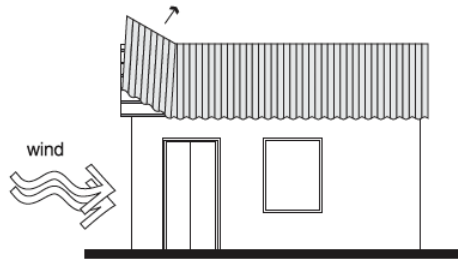
The overall effect of wind on a pitched roof and the critical failure locations are shown below:



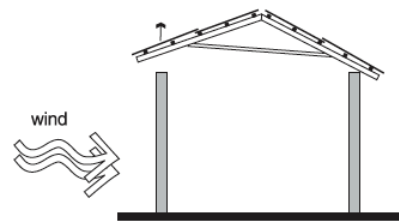
Roofing Sheet is lifted



Rafter or batten lifted from rafter



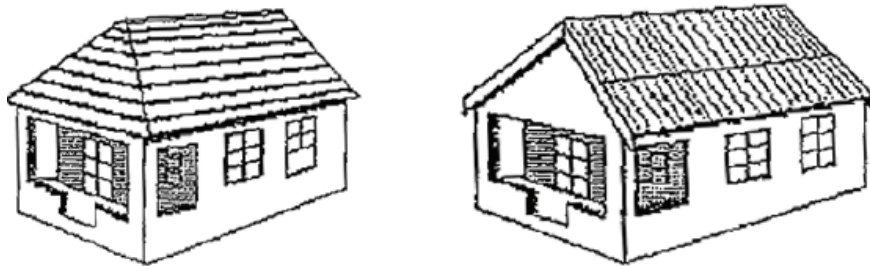
Roofing sheet lifted from Gable end



Rafter ripped off the wall because not anchored properly

Sketch 7: Examples of Failure of pitch roof

For reducing wind forces on the roof, a hipped roof is preferable to the gable type roof since hip roof gets lower lift. See sketch below:



Sketch 8: A Hip Roof (left) is generally more cyclone resistant than a Gable Roof (right)

For protection from rain, a minimum roof projection of 500 mm all round is desirable. Tying down the projection is a must, as shown in the sketch below:



Sketch 9: Tie roof overhang @ 500 mm to wall

**Thatch Roof:** Thatched roof should be properly tied down to wooden or bamboo framing underneath by using organic or nylon ropes in diagonal pattern. The spacing of rope should be kept 450 mm or less so as to hold down the thatch length. When the cyclone season approaches, it is always good to inspect the roof and the ropes in advance. Damaged and worn ropes must be replaced during this time.



Sketch 10: Diagonal bracing with ropes for thatch roof

### Verandah and Overhang:

Overhangs and verandas experience high wind pressures and should be kept short and small. Best to build veranda and overhang roofs as separate structure rather than extensions of the main building. They may blow off without damaging the main building.



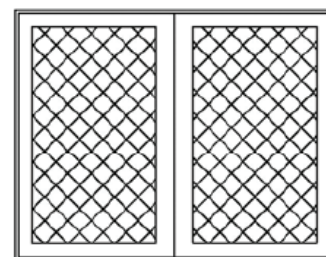
Sketch 11: Build veranda and porch roof as separate structure rather than extension of the main building

### Openings and Windows:

Openings and windows in general are areas of weakness and stress concentration, but they are needed for light and ventilation.

The following are recommended in respect of openings:

- (i) Openings in walls should not be within a distance of  $h/6$  from inner corner (of wall) for the purpose of providing lateral support to cross walls, where 'h' is the height of the storey up to just below the roof level.
- (ii) Openings just below roof level must be avoided except that two small vents without shutter should be provided in opposite walls to prevent suffocation in case room gets filled with water and people may try to climb up on the lofts.
- (iii) The sum of the widths of all openings in a wall should not exceed one third the total wall length in cyclone prone areas and 40 percent in other areas.
- (iv) The bearing length (embedment) of lintels on each side of an opening should not be less than 300 mm.
- (v) Since the failure of any door or window on the wind-ward side may lead to adverse uplift pressures under roof, the openings should have strong holdfasts as well as closing/locking arrangement.
- (vi) Glass panes can be strengthened by pasting thin film or paper strips. This will help in holding glass shards from flying in case of breakage. It will also reduce vibrations.

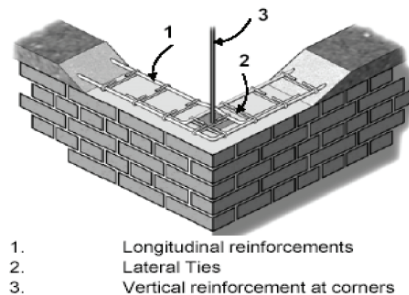


Sketch 12: Window Glass protected with adhesive tapes

## CONSTRUCTION GUIDELINES:

### Walls:

It is preferred to construct buildings like a framed structure with the roof securely tied to the wall elements. Corners and wall junctions are to be reinforced with bars. Vertical reinforcing bars are to be placed against uplift, between the foundation, lintel, and roof band and between eave band (roof band) and gable band. One 12 mm. high strength deformed (HSD) bar is to be placed at each corner and every junction of walls and tied with longitudinal reinforcement. See sketch below:

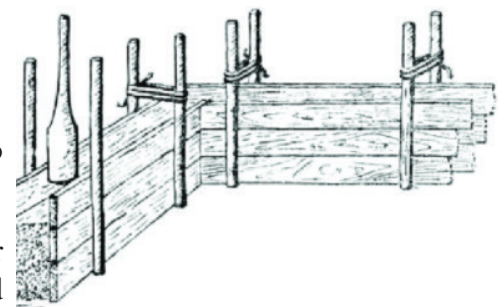


Sketch 13: Longitudinal and vertical reinforcements for walls

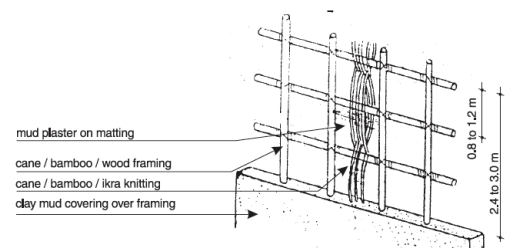
The same principle applies for traditional buildings also.

Earthen Walls can be constructed in the following ways:

1. Hand-formed mud-lumps placed in layers on top of each other to form the wall and compacted.
2. Built by using sun-dried mud blocks or stabilized mud blocks or adobe which may be cut from hardened soil or formed in moulds and compacted and laid in courses using clay mud or lime-sand as mortar. Blocks can be made using block making machines developed by CSIR or ASTRA etc.
3. Built by using rammed earth in which moist soil is filled between wall forms and compacted manually by ramming the mud by hand with a wooden tamper.
4. Wall constructed using wood or bamboo structure with cane or ikra knitting or bamboo matting enclosure and plastered on both sides with mud.



Sketch 14: Simple Formwork for making rammed earth Wall



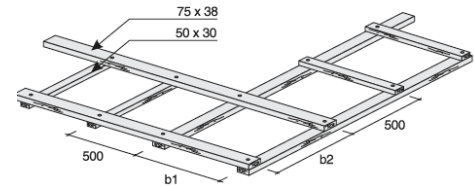
Sketch 15: Details of Ikra Wall

### Some more guidelines:

- The height of the earthen building should be preferably restricted to one storey only in cyclone prone areas.
- The length of a mud wall, between two consecutive walls at right angles to it, should not be greater than 10 times the wall thickness “t” or more than 3000 mm. When a longer wall is required, the walls should be strengthened by intermediate vertical buttresses.
- The width of an opening should not be more than 1200 mm. The distance between an outside corner and the opening should be not less than 1200 mm. The sum of the widths of all openings in a wall should not exceed one third the total wall length in cyclone prone areas.
- Hand-formed mud walls should preferably be made tapering upwards keeping the minimum thickness as 300 mm at top and increasing thickness by 1:12 towards the bottom.

- The footing should preferably be built by using stone or fired brick laid with lime mortar. Alternatively, it may be made in lean cement concrete (cement: sand: gravel: stones as 1:4:6:10). Lime could be used in place of cement in the ratio lime: sand: gravel as 1:4: 8.
- Plinth Masonry. The height of plinth should be above the flood water line or a minimum of 300 mm above ground level. It will be preferable to use a waterproofing layer or heavy black polythene sheet at the plinth level before starting the construction of the superstructure wall.

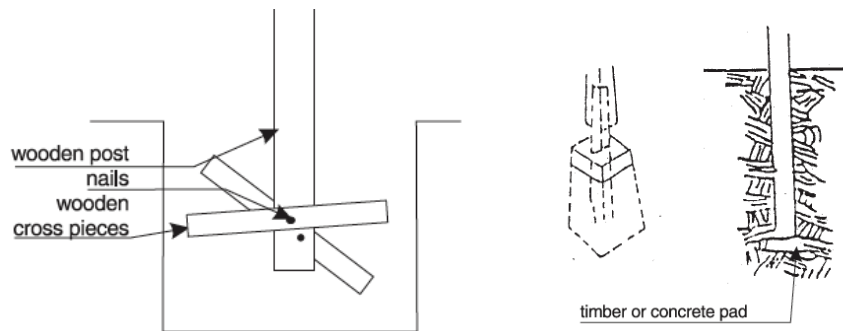
A running horizontal band in a bed of 75 mm thick lime-sand mortar 1:3 must to be placed all along the walls as shown in the sketch here. The band can be made of split bamboo or wooden bands with wooden bracing and placed at the lintel and eaves level or just below the roof. It will be used to anchor the roof truss as well as tied to the vertical members that go down to the foundation.



The earthen walls should be strengthened by having vertical wooden or bamboo members placed at the corners and at each wall joints. In the sketch above, b1 and b2 are wall thickness.

### Foundation:

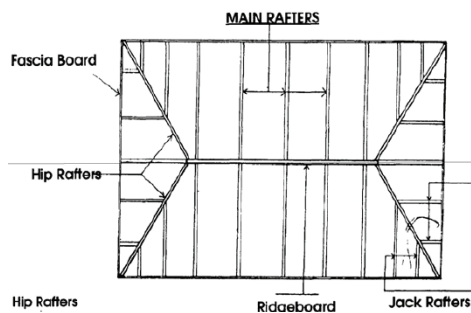
The horizontal members must be taken down into firm ground and anchored with bamboo or wooden pieces that are firmly tied with ropes and nailed together to the horizontal member and embedded in a trench 450 to 750 mm deep below ground level and placed firmly in cement: sand: gravel: stones as 1:4:6:10 or lime :gravel :mud mortar of 1:5:10. Alternatively, the horizontal member may be placed over a piece of timber, stone or thin cement slab in a trench 750 mm below ground level and compacted with dry earth topped with cement-sand mortar 1:6.



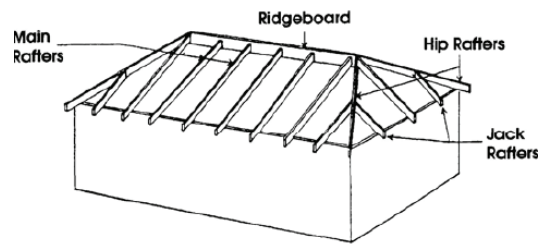
Sketch16: Anchoring the building foundation

### Roof:

As mentioned earlier, hipped roof is one of the relatively stronger type of roof with all sides of the roof sloped. There are no gable ends in this roof. Instead, rafters come across diagonally from the corner and meet the ridge board at short distance from the ends of the house. Experience and experiment have shown that the hip roof with the pitch of 25° to 40° range has best record of wind resistance. The different structural members of a hip roof are illustrated in the sketch below:

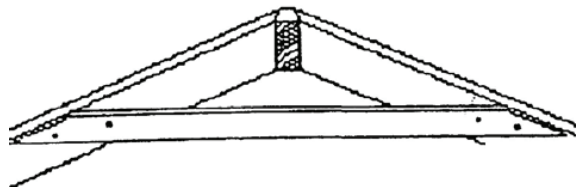


Sketch 17: Plan and elevation of hipped roof illustrating the placement of different rafters



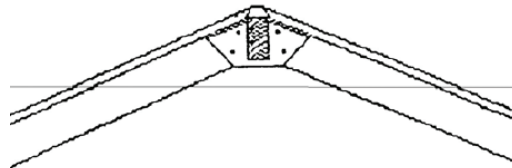
The ridge should be secured by using any of the following methods:

**COLLAR TIES** - Timbers connecting the rafters (most common). They are nailed to the side of the rafters.



COLLAR TIE

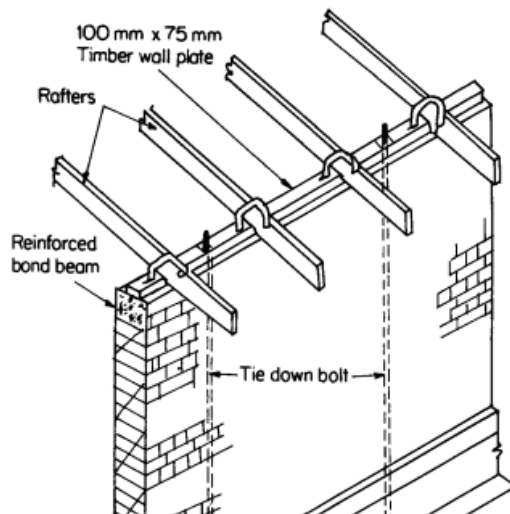
**GUSSETS** - Usually made of steel or plywood. This is used at the ridge to fix it.



GUSSET

### Anchoring of roof framing to wall/posts:

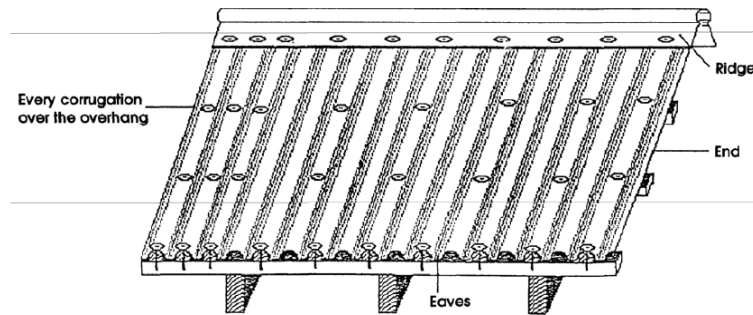
The proper connection of roof framing to the wall or post, is equally important for overall stability of the roof. Typical anchoring or connection of rafters with roof ties to the reinforcement band below the roof as shown in the sketch below must be done



Sketch 18: Fixing the roof (rafters) to the reinforcement band in the wall

To secure corrugated sheeting to roof structure:

1. Must fix every two (2) corrugation at ridges, eaves and overhangs.
2. Must fix every three (3) corrugation as maximum spacing at all other locations.



Sketch 19: Fixing corrugated roof sheet

When fixing roofs, use fittings with a broad washer or dome head (nail). To use more fixings for each sheet, the laths should be at closer centres and nailed closer together. Best is to use screws instead of nails. Nails do not hold as well as screws. It must be ensured that the screws go into the purlins by at least 50 mm. Using large washers under the screw heads will prevent the roof sheets from tearing when pulled upward by high winds.

### IN CONCLUSION:

I earnestly hope, people of coastal West Bengal particularly, those who are in the process of reconstructing their buildings will find these design and construction guidelines convenient and useful to follow and understand.

# Glimpses of trip to Renukaji Lake

*Pradip Mukherjee, Chemical Engineering, 1966*

Alumni Association NCE Bengal and Jadavpur University, Delhi Chapter covers plethora of activities throughout the year for social, cultural and professional interactions amongst members and their families.

One of the popular sojourns is our Annual Picnic, a day's event to nearby parks or gardens – moving in chartered buses in groups or own vehicles. A welcome change from the serious routine engagements to a lighter environment of fun and laughter with friends and families for a day long relaxation and rejuvenation.

Idea of an outstation picnic with overnight stay remained in a floating stage for a long time which could not fructify for obvious constraints including reluctance to venture out from our comfort zones.

However, at the drastic initiative of our young adventurous members especially Suhan, the long-awaited episode saw the end of the tunnel.

After lot of permutation and combination, the decided place for excursion was Renukaji Lake, based on proven experience of some members particularly Dulal who had the opportunity to visit there earlier.

The designated place is located at a distance of 130 kms. from Chandigarh via Nahan.

The date of visit was finalized in a weekend from 21st to 23rd February, 2020 to reduce the leave requirements of professionals.

Next area of focus was on mode of transport selection which had a sizable impact due to variance in opinions (popular saying – more opinions generate more confusions in democratic set-up). The digital debate was choice between entire road journey (Delhi to Renukaji) or a combination of train (Delhi to Chandigarh) and road journey (Chandigarh to Renukaji) with same philosophy for return journey. The entire overnight road journey concept was perhaps over-designed considering senior citizens as teenagers. Ultimately, combined rail and road journey was adopted to reduce the strain of overnight bus journey compared to sleeper train journey available with wash room facility. Besides saving energy for next day's hectic activity in visiting a new place without feeling tired and sleepy so that it becomes a pleasurable and not a punishment project.

The alumni members were apprised of the detailed program with commercial implications in WhatsApp to confirm participation. The initial big response slightly fizzled out due to unforeseen commitments/sickness.

Entire infrastructural arrangement covering rail bookings, bus reservation, accommodation confirmation, catering, entertainment, etc. were organized by the young members to full satisfaction of participants. As a consequence, almost everybody fully relaxed as required things were provided with personal care specially to seniors as per requirement. Our team was a royal combination of senior and junior citizens both ladies and gentlemen along with children.

Trip commentary may not be complete without brief description of the geographical and historical sanctity of the place. The place is 672 meters above sea level having natural scenic beauty in the midst of small mountains with the largest lake of Himachal Pradesh, having a circumferential road of about 2.5 kms. It is equipped with a uniquely located modern tourist lodge of H.P. govt., boating facilities and even fishes visible in the lake as well as a mini zoo surrounded by temples of Renukaji. She was the wife of sage Janadajini and mother of Parshuram, one of the 10 avatars of Lord Vishnu.

On 21st evening, we assembled in the old Delhi railway station to board Kalka mail which incidentally arrived 5 hours beyond schedule at 01-30 a.m. But in-spite of the long wait, the spirit of the entire team was not even slightly dampened. It was considered blessing in disguise as we reached Chandigarh in early morning hours instead of mid-night odd hours. After waiting for a small duration, we proceeded to our final destination Renukaji Lake and had breakfast en-route.

After reaching the lodge, we had enough time to relax before taking shower followed by lunch. In the afternoon, we moved in different directions in scattered fashion suiting individual interest. In the evening, we all assembled in a big room for fun, music, jokes and gossips along with dinner prior to retiring.

Next morning, after bed tea, we had the opportunity to visit different surrounding temples and returned to lodge for bath followed by breakfast. Subsequently, our return journey lap started. We stopped at Nahan for lunch before proceeding to Chandigarh station to catch New Delhi Satabdi express to be back to our own abodes.

I have no hesitation to advocate visiting this place with family and friends for 2/3 days with prior transport and H.P. govt. tourist lodge reservation.

We shall continue to cherish this pleasant trip for a longtime and look forward to similar endeavors.



## আইসল্যান্ডে কয়েকদিন

ড: রাজর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ২০০৬

### ভূমিকা:

গত প্রায় ৮ বছর হল একটি ড্যানিশ সংস্থায় চাকরি করি। কর্মসূত্রে মাঝেমধ্যেই কোপেনহেগেন যেতে হয়। সেখানকার কোনো কোনো সহকর্মীদের কাছ থেকে আইসল্যান্ডের গল্প শুনতাম। 'Land of fire and ice', ওখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নাকি পৃথিবীর অন্য সব জায়গার থেকে আলাদা - আরো কত কি। এইসব শুনতে শুনতে গত কয়েকবছর ধরেই বেশ একটা আইসল্যান্ড যাওয়ার ইচ্ছে জেগে উঠেছিল। আরেকটাও কারণ ছিল। সেই ছোটবেলায় কোন এক গল্পে পড়েছিলাম - If diamonds were as plentiful as pebbles, people wouldn't have stooped to pick them up. ভারতবর্ষের খোলা অর্থনীতির প্রায় তিরিশ বছর হতে চললো। তাই আর যাই না থাকুক না কেন, একটু ভদ্রস্ত চাকরি করা ভারতীয়দের হাতে এখন পয়সার বিশেষ কোনো অভাব নেই। অনেকেই ফি বছর না হলেও, দু বছরে একবার তো বিদেশে বেড়াতে যাচ্ছেই। সি.আর.পার্কের রাস্তায় হেটে যাওয়া ৫ টা মানুষের গায়ে ঢিল ছুড়লে তো একজনকে পেয়েই যাওয়া যাবে যে গত দু-তিন বছরের মধ্যে আমেরিকা, ইউরোপ বা অস্ট্রেলিয়া ঘুরে এসেছে। কিন্তু আইসল্যান্ড - হু হু বাওয়া, যে সে জায়গা নয়। কজনই বা আর গেছে আইসল্যান্ড? তাই সেখানে যেতে পারলে বেশ একটা কাজের কাজ করা যাবে। বেশ বগল বাজিয়ে লোকজনকে বলা যাবে (সেটাই করছি এখন!)। সেই আশাতেই বুক বাঁধা।

সুযোগ এলো গত বছর। ৬ মাস থাকতে হবে ডেনমার্ক, আইসল্যান্ডের প্লেন খরচ যেখান থেকে অনেকটাই কম। এ সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। ৬ মাসের মধ্যে বউও থাকবে সঙ্গে ৩ মাস। তার নিজেরও ঘোরার প্রচুর উৎসাহ। কিছু জায়গা আমরা একসাথে যাবো, আর কিছু জায়গায় ও একা (আমার পক্ষে অত ছুটি নেয়া তো সম্ভব নয়)। বৌকে বললাম লিস্ট বানাও - এইটাই করলাম প্রথম ভুল। লিস্ট তৈরী হল এবং তাতে আইসল্যান্ড নেই! এটা হচ্ছে জেনেশুনে ফাঁদে পা দেয়ার মত। বৌ শহর ঘুরতে ভালোবাসে - তার লিস্টে যে আইসল্যান্ড থাকবে না সেটা আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার। যাইহোক, বলতে বাধ্য হলাম যে আমি আইসল্যান্ড যেতে চাই। এরপর যা হওয়ার ছিল, ঠিক তাই হল - লম্বা তর্ক-বিতর্ক ও মান-অভিমানের পর্ব। আইসল্যান্ড যেতে প্রচুর খরচ, সেখানে না গেলে আমরা অন্য দুটো জায়গা যেতে পারি অথবা অন্য জায়গাগুলো আরো ভালোভাবে ঘুরতে পারি; আমি এমনিতে নাকি পয়সা নেই বলি সবসময়, কিন্তু নিজের কিছু করার ইচ্ছে হলে ঠিক পয়সা জোগাড় হয়ে যায়; আমি যদি আগে থেকেই ঠিক করে ফেলেছিলাম যে আইসল্যান্ড যাবো তাহলে সেটা লিস্ট বানানোর আগে বললাম না কেন, ওকে কম খাটতে হত - ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমিও বলতে শুরু করলাম যে ঠিক আছে, আমি আবার পরে যখন ডেনমার্ক যাবো একা তখন ঘুরে আসবো আইসল্যান্ড। এইসব বাক-বিতণ্ডার পরে শেষমেশ মধ্যস্থতা - আইসল্যান্ড যাবো আমরা, কিন্তু পুরোটাই আমার পয়সায় করতে হবে; বৌ নিজের টাকা খরচ করবে না কারণ ও আইসল্যান্ড যাওয়াকে নৈতিকভাবে সমর্থন করে না। অতঃপর আইসল্যান্ড - ২৬ থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০১৯।

### যাত্রা:

নির্দিষ্ট দিনে চেপে বসলাম কোপেনহেগেন এয়ারপোর্ট থেকে 'আইসল্যান্ডিক এয়ার'-এ। সরাসরি গন্তব্য আইসল্যান্ডের রাজধানী রেইকজাভিকের কাছে অবস্থিত আইসল্যান্ডের একমাত্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কেফালাভিক। দ্রাঘিমা বরাবর মাপলে আইসল্যান্ড আটলান্টিক মহাসাগরের প্রায় মাঝামাঝি পরে। আর রাজধানী রেইকজাভিক অবস্থিত দেশের একদম দক্ষিণ-পশ্চিম বিন্দুতে। তাই কোপেনহেগেন থেকেও নয় নয় করে প্রায় তিন ঘন্টার ফ্লাইট। আইসল্যান্ডিকের সাধারণতঃ বেশ লম্বা হয়; তাই ইকোনমি বিভাগেও দুটি রোএর মাজখানে বেশ অনেকটা পা ছড়ানোর জায়গা। তিন ঘন্টা বসে যেতে কোনই অসুবিধা হল না। এই মুহূর্তে আইসল্যান্ড সম্বন্ধে আরো কয়েকটা কথা বলে নেয়া ভালো। গুগলের দৌলতে এই সব তথ্য সকলের পক্ষেই পেয়ে যাওয়া সম্ভব, তাও লেখার খাতিরে বলা প্রয়োজন। আইসল্যান্ডের আয়তন ৪০,০০০ বর্গ মাইল আর সেখানের

জনসংখ্যা হল তিন লক্ষ ষাট হাজারের সামান্য বেশি। তুলনামূলক ভাবে বোঝার জন্য বলা যেতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৩৪,২০০ বর্গ মাইল আর সেখানে মোটামুটি ১০ কোটি লোক থাকে। অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা - জায়গাই জায়গা। এর মধ্যে আবার রাজধানী রেকর্ডভিকেই থাকে এক লক্ষ তিরিশ হাজার লোক - তো বাকি জায়গা প্রায় পুরোটাই খালি। থাকার মত জায়গাও নয় অবশ্য; দ্বীপের মধ্যস্থানটা পুরোটাই আগ্নেয়গিরি আর হিমবাহে ভর্তি। যেটুকু জনবসতি তা আটলান্টিক মহাসাগরের ধার ঘেঁষেই মোটামুটি। আরেকটা কথা বলে নেয়াও প্রয়োজন - আইসল্যান্ড একটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল জায়গা; সব কিছুর দামই অত্যন্ত বেশি।

### **ভ্রমণ:**

প্রথম দিন: বিমানবন্দরের কাছ থেকেই সেলফ-ড্রিভেন কার নেয়ার কথা ছিল। ইন্টারনেট ঘেটে এবং আমার এক সহকর্মী যে এর আগে আইসল্যান্ডে গেছে, তার সঙ্গে কথা বলে যা বুঝেছিলাম যে নিজে গাড়ি চালিয়ে ঘোরাটাই এই দেশে সবচেয়ে সুবিধাজনক। Suzuki Vitara 4WD - এই হল আমাদের বাহন। এত বড় গাড়ি চালাইনি আগে কখনো; তারপর আবার ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতই ভারতের তুলনায় উল্টো দিকে চালকের বসার জায়গা। সব মিলিয়ে যে একেবারেই বুক ধুকপুক করছিলো না তা নয়। কিন্তু বিমানবন্দর থেকে শহরে আসার হাইওয়ে ধরে যে ২০-২৫ মিনিট রাস্তা, তাতেই বেশ সড়গড় হয়ে গেলাম এবং বুঝলাম যে আইসল্যান্ডে গাড়ি চালানোটা প্রায় গড়ের মার্চে গাড়ি চালানোর মত ব্যাপার, শুধু রাজধানীটুকু বাদ দিলে।

প্রথমদিন আমাদের আস্তানা রেকর্ডভিক শহর থেকে আদ ঘন্টা মত দূরে ফেরাগেরডি (Hveragerdi) বলে একটা ছোট্ট জায়গায়। এখানে বলে রাখা দরকার যে আইসল্যান্ডিক ভাষা বলা অত্যন্ত শক্ত এবং অন্যান্য সমস্ত স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ও নর্ডিক ভাষার মতোই এরা যা বলে আর যা লেখে তার মধ্যে বিস্তর ফারাক। এছাড়াও, আইসল্যান্ডিক ভাষার ইংরাজীর বাইরেও কিছু নিজস্ব বর্ণ আছে। সব মিলিয়ে বেশ গোলমালে ব্যাপার। যাইহোক, থাকার ব্যবস্থা রেকর্ডভালুর গেস্ট হাউস বলে এক জায়গায়। সেখানে পৌঁছানোর আগেই মোবাইলে দরজা খোলার জন্য একটা নম্বর চলে এসেছিল। গিয়ে দেখলাম লোকজনের কোনো বালাই নেই - সবটাই স্বয়ংক্রিয় ব্যাপার। এমনতেও লোক এতই কম, আমাদের দেশের মত জো-হুজুরী করার কোনো প্রশ্নই নেই। জিনিসপত্র রেখে আশেপাশে একটু হেটে এলাম। খাওয়ার জায়গা বলতে গেলে একটাই; সেখান থেকেই নৈশভোজ সেরে তাড়াতাড়ি ঘরে চুকে পড়লাম। আগে শুনেছিলাম আইসল্যান্ডে নাকি সাংঘাতিক ঘন ঘন আবহাওয়া বদলায়। তার অভিজ্ঞতা প্রথম দিনেই হয়ে গেল। ঘরে ফিরে আসার অল্প সময় পর থেকেই ভয়ানক ঝড় শুরু হল - একটু আগেও যার নামগন্ধ ছিল না।

দ্বিতীয় দিন: পরদিন সকালে উঠে দেখি আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার - ঝড়ঝঞ্ঝার বালাই নেই। মনটা ভালো হয়ে গেল। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল যে এখানকার এক বিখ্যাত বেকারিতে (আলমার বেকারি) প্রাতঃরাশ সারবো। আশপাশটা একটু ঘুরে দেখে এসে একদম জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে পরবো বেকারির উদ্দেশ্যে, এইরকমই ঠিক করলাম। বেরিয়ে পরলাম গাড়ি নিয়ে। আইসল্যান্ড দেখা শুরু হল। প্রথম পনের মিনিটেই যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সম্মুখীন হলাম, তা ভাষায় প্রকাশ করার মত বিভূতিভূষনীয় ক্ষমতা আমার নেই, লেখার ধৈর্যও নেই। একটা ছবি দিলাম তার বদলে (ছবি ১) - নিজেরাই কল্পনা করে নিন স্থানমাহাত্য।

প্রাতঃরাশ সেরেই ধরে ফেললাম হাইওয়ে - গন্তব্য সেল্যান্ডফোস (Seljalandfoss) ও স্কগাফোস (Skogafoss) বলে দুটো জলপ্রপাত। আইসল্যান্ডে প্রচুর আগ্নেয়গিরি আছে সেটা আগেই লিখেছি। সেসবের গা থেকে ঝরে পরা বিভিন্ন জলপ্রপাত এই দেশটার বিশেষ দৃষ্টব্যঃ। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতেও আকাশের অপরূপ শোভা - মেঘ ও রোদের খেলা। প্রত্যেকটি দৃষ্টব্যের সম্বন্ধেই অনেক কথা লেখা যায়। কিন্তু সেসব লিখতে শুরু করলে এই লেখা আর শেষ করতে পারবো না। তাই সেই চেষ্টায় আর যাচ্ছি না।

প্রথম দুই জলপ্রপাত নির্বিঘ্নেই দেখা হল। হাল্কা বৃষ্টি পড়ছিল ঠিকই, কিন্তু তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়। এরপর যাওয়ার কথা একটি সমুদ্রসৈকতে। কিন্তু তখনই দেখা দিল বিপত্তি। ভয়ানক বৃষ্টি শুরু হল। গাড়ি চালাতে চালাতে মনে আশা ছিল যে পৌঁছতে পৌঁছতে আইসল্যান্ডিক আবহাওয়া তার খেল দেখিয়ে আকাশ পরিষ্কার করে দেবে। কিন্তু এক সময়ের পরে বুঝলাম যে আজ আর তা হবে না। গাড়ি ঘুরিয়ে নিলাম কাছের একটা শহর ভিক (Vik) এর দিকে। সেখানে গিয়ে একটা ছোট সংগ্রহশালা দেখলাম। কিছুই আহামরি নয় - একটা ভাইকিং জাহাজ এবং তাকে ঘিরে ইতিহাস। সংগ্রহশালার উল্টোদিকের একটি কিউরিও শপ এ কিছুক্ষণ ঘুরোঘুরি করলাম; তার পাশের একটা দোকানে বসে কফি খেলাম। তখনো অব্যবহিত বারিধারা বর্ষিত হচ্ছে। কি করা যায়? ইন্টারনেট ঘেটে দেখলাম কাছাকাছির মধ্যে 'আইসল্যান্ডিক লাভা শো' বলে একটা ব্যাপার আছে; রেটিং খুবই ভালো। দামও অত্যন্ত ভালো - এক একটি টিকেট প্রায় আড়াই হাজার টাকা। কিন্তু আর কিছুই যখন করা যাচ্ছে না, সিদ্ধান্ত নিলাম যে এটাই দেখা যাক।

শো টা দেখে জীবনে আরেকবার উপলব্ধি করলাম যে ভগবান যা করেন বোধহয় মঙ্গলের জন্যই করেন। এরকম জিনিস এর আগে আর কোথাও দেখি নি। ভবিষ্যতেও আর দেখবো কিনা সন্দেহ আছে। চোখের সামনে দেখানো হল কিভাবে আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নুপাত ঘটে, লাভার নদী তৈরি হয়, বরফের তলা দিয়ে লাভা গেলে ভিন্ন তাপ পরিবাহিতার জন্য তা ফুলে গিয়ে ভোলকানিক লাভা কেডের সৃষ্টি হয় ইত্যাদি। সব মিলিয়ে এক অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতা। বেরিয়ে দেখলাম সন্ধ্যা হয় হয়। সে রাতের থাকার জায়গা ভিক শহর থেকে প্রায় ৪৫ মিনিটের দূরত্বে; সেদিকেই রওনা দিলাম। যেখানে পৌঁছলাম, সেটাকে প্রায় তেপান্তরের মার্ঠের ধারের বাড়ি বলাই ভালো। সাকুল্যে দশটা বাড়ি আর চারপাশে ধূ-ধূ প্রান্তর, দূরে পাহাড়। একে গ্রাম বলা যায় কিনা জানি না; তারই মধ্যে একটা গেস্ত হাউস। ব্যবস্থাপনা ভালোই, সেখানেই দূরের হাইওয়ের আলো দেখতে দেখতে নিশিযাপন।

তৃতীয় দিন: পরদিন বেরিয়ে পরলাম অনেক সকালে। আগেরদিন যে জায়গাগুলো দেখার প্ল্যান ছিল কিন্তু বৃষ্টি মাটি করে দিল, সেগুলো দেখে ফিরতে হবে প্রাতঃরাশের আগেই। প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা গেস্ত হাউসেই। সকাল সাড়ে ছটার দিকে পৌঁছলাম রেনিসদ্রাঙ্গার ক্লিফ (Reynisdrangar Cliff) এবং তার লাগোয়া বিচো। পর্যটক তখন প্রায় কেউই নেই। ফলস্বরূপ অন্য এক অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটছে তখন সেখানে - নুড ফোটোগ্রাফি। কোনো পত্রিকার জন্য খুব সম্ভবত। ৪-৫ টি মডেল এবং একগুচ্ছ আলোকচিত্রকর এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গ। ভালোই ঠান্ডা এবং তার সঙ্গে সামুদ্রিক হাওয়া; বেশ গা হির হির করা ব্যাপার। মডেলদের অবস্থা তখৈবচ। কোনো রকমে শুট শেষ হতেই লোকজন গায়ে জামা জড়িয়ে দিয়ে হাত পা ঘষে দিচ্ছে। কিছু দূরে আবার একটা ব্রাইডাল ফটোশুট। তা এতরকম শুটের মধ্যে আমরা নন-ফটোজেনিক যুগল প্রকৃতি উপভোগ করলাম। এই সৈকত আবার তার চোরা চেউয়ের জন্য বিখ্যাত - সামনেই শেষ যে ব্যক্তি মারা গেছে তার বিবরণ দেয়া। তাই জলের কাছে যাওয়ার বেশি সাহস হল না।

পরের গন্তব্য দির্হলে (Dyrholaey)। এটাও একটা ক্লিফ; আগের ক্লিফটার কাছেই, আর এটার উপরে ওঠা যায়। উপর থেকে এক অপরূপ দৃশ্য। সামনে কালো বালির সমুদ্রসৈকত আর পেছনে তুষারাবৃত আগ্নেয়গিরি - ছবি দিলাম (ছবি ২)।

প্রাতঃরাশ সেরে গেস্ট হাউস থেকে চেক আউট। গন্তব্য অত্যন্ত দুর্গম জায়গার জলপ্রপাত হাইফস (Haifoss)। অত্যন্ত সুন্দর যুগল জলপ্রপাত। ছবিতে (ছবি ৩) যদিও একটাই দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে ফেরার পথে এক জায়গায় রাস্তা দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে - একদিকে হাইওয়ে, অন্যদিকে একটা নেচার ট্রেইল। সামনে সাইনবোর্ডে লেখা যে ৪ চাকার ড্রাইভ ওলা গাড়ি বাধ্যতামূলক। সেইদিকেই এগিয়ে গেলাম; হাতে সময় ছিল কিছুটা। সে এক অত্যাশ্চর্য ৪ কিলোমিটার রাস্তা। চারিপাশ উঁচুনিচু মাটিতে ভর্তি; সামান্য কিছু হলদেটে ঘাস আর যত্রতত্র পরে থাকা পাথর - আর কিছুটি নেই। প্রায় চাঁদে চলে এসেছি বোধ হয়। এই রাস্তাতেই আমাদের বাহনের সাথে ছবি দিলাম একটা (ছবি ৪)। এ রাস্তা কোন নেচার ট্রেইলে নিয়ে যাবে ভগবান জানে। কিন্তু যেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, ঠিক যেন যশ চোপড়ার সিনেমার সেট। লিখবো না কিছুই, ছবিই যথেষ্ট (ছবি ৫); সহকর্মীর কথা শুনে ৪ চাকার ড্রাইভ ওলা গাড়ি নেয়া সার্থক হলো।। এরপর আরো একটি বিখ্যাত জলপ্রপাত গুল্ফস (Gulfoss) এবং আরো বিখ্যাত গেসির (Geysir) - মাটি থেকে পর্যায়ক্রমে উদ্গত গরম ফোয়ারা - দেখে সে রাত্রির থাকার জায়গায় চলে এলাম।

চতুর্থ দিন: এই গেস্ট হাউসের মালিক হারালদুর অত্যন্ত অতিথিবৎসল। প্রাতঃরাশে আইসল্যান্ডিক যা যা জিনিষ আছে সেগুলো সব অতিথিকে আলাদা আলাদা ভাবে বোঝাচ্ছেন। ওনার কথাতেই জীবনে প্রথমবার প্রাতঃরাশে মাছ খেলাম (কেউ কেউ সকালে চায়ের সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজা খায় শুনেছি; আমি ঠিক অতটা ইলিশপ্রেমী নই) - কিউরড হেরিং; অত্যন্ত সুস্বাদু তাতে কোনো সন্দেহ নেই। খেতে খেতেই আলাপ হল এক বয়স্ক মার্কিন দম্পতির সঙ্গে। দেখলাম তারা বড় মাপ দেখে গাড়ি চালাচ্ছেন এই জিপিএস এর জমানায়। অত্যন্ত অবাক হলাম ও অনেক গল্প করলাম।

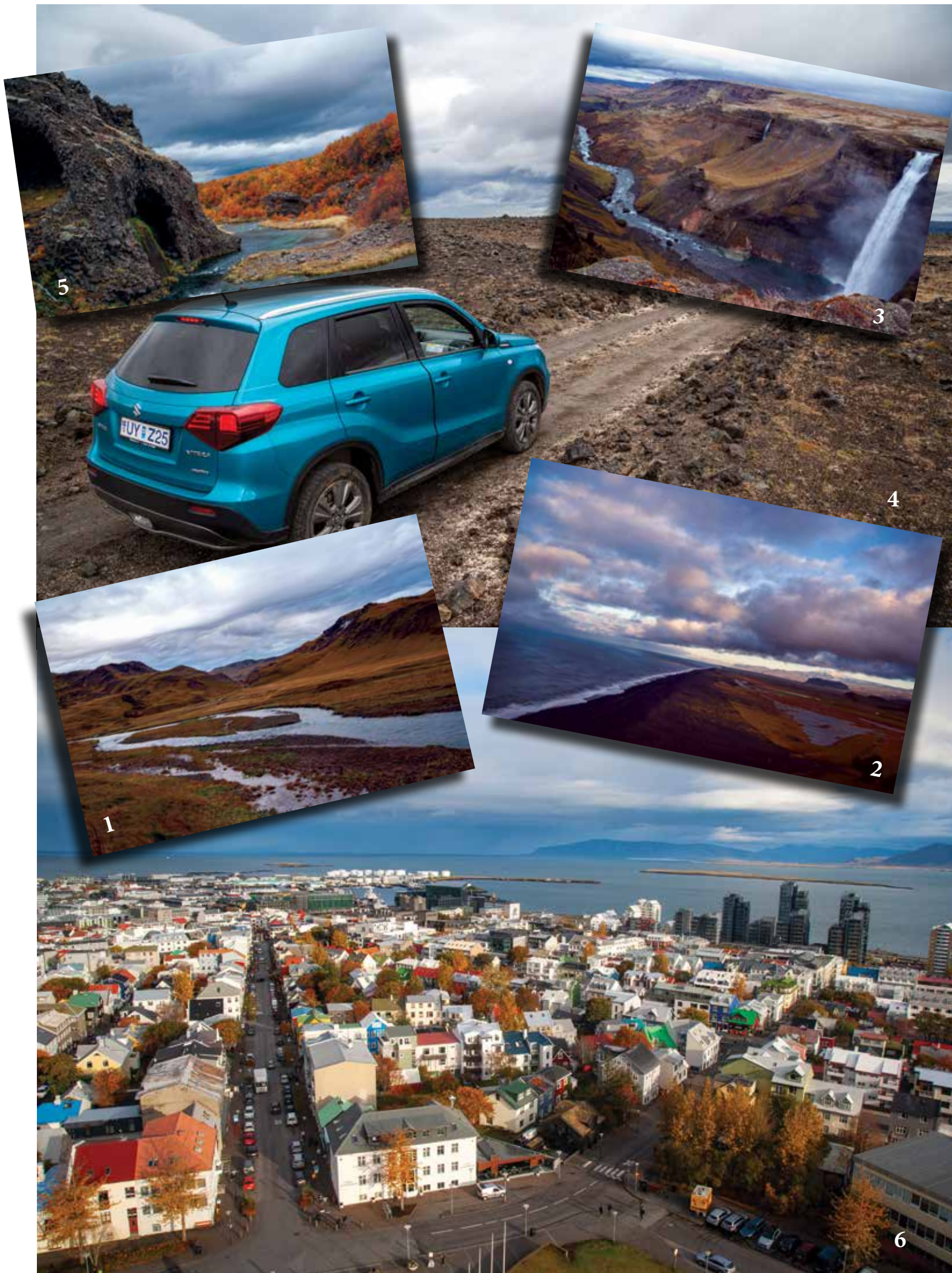
সেদিনের প্রধান গন্তব্য থিংভেলথলির (Thingvellir) জাতীয় উদ্যান। আইসল্যান্ড সম্রাট ইন্টারনেট এ সার্চ দিলেই সবার প্রথমে এই নামটাই আসে। অনেক দর্শনীয় স্থান এই উদ্যানের মধ্যে এবং সে সবেই অনির্বচনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। আরেকটা জিনিষ না বললেই নয়। এই উদ্যানের ভিতর সিলফ্রা বলে একটি জলাশয় আছে। তার দুটো বৈশিষ্ট্য; প্রথমত এর জল অত্যন্ত পরিষ্কার, প্রায় ৬০০ মিটার তলা পর্যন্ত দেখা যায় উপর থেকে; আর দ্বিতীয়ত এর একটি জায়গায় ডাইভ দিয়ে এক হাতে নর্থ আমেরিকান এবং অন্য হাতে ইউরেশিয়ান টেকটোনিক প্লেট ছোঁয়া যায়। সময়ের অভাবে ডাইভিং করে হয়ে ওঠা হয়নি আমাদের। থিংভেলথলির থেকে বেরিয়ে আরো কিছু জায়গা ঘুরে থাকার জায়গায় পৌঁছনো গেল - রাজধানী রেইকজাভিকের কাছেই একজনের বাড়িতে পেয়িং গেস্ট।

পঞ্চম দিন: শেষদিনের জন্য বরাদ্দ রাজধানী ঘোরা। প্রথমে গেলাম ওখানকার বিখ্যাত গির্জা হলগ্রিমকির্কজা (hallgrimkirkja)। অত্যন্ত নতুন গির্জা এবং চিরাচরিত গির্জার থেকে একেবারেই অন্যরকম স্থাপত্য ও অলঙ্করণ। খুবই ভালো লাগলো আমার। এরই উপর থেকে তোলা রেইকজাভিক শহরের একটা ছবি দিলাম (ছবি ৬)। এরপর একজন গাইডের সঙ্গে হেটে শহর ঘোরা। সে আবার একজন কৌতুকাভিনেতাও; অত্যন্ত হাসির হাসির ঘটনা বললো সব দৃষ্টব্যগুলির সম্বন্ধে। অচিরেই সময় শেষ। গাড়ি ফেরত দিয়ে প্লেনে ওঠার সময়। বিদায় আইসল্যান্ড।

শেষ করার আগে আরেকটা জিনিস বলা প্রয়োজন। কোথাও ঘোরার একটা স্বকীয় ব্যাপার হল সেখানের বিভিন্ন ধরণের খাবার খাওয়া। সেটা যে আমরা খুব বেশি করতে পেরেছিলাম তা নয়, কারণ সবকিছুর অত্যন্ত দাম। তবে একেবারেই করিনি বলা ভুল। সে কাহিনী পরে কোনো এক সময়ে। শুধু একটা সতর্কবার্তা - আইসল্যান্ডের একটা বিখ্যাত স্ন্যাক (বিশেষতঃ পানীয়র সাথে খাবার জন্য) হল মাখনে ডুবিয়ে শুকানো মাছ খাওয়া। খবরদার চেষ্টা করতে যাবেন না - অনুরোধের ভাত উঠে আসবে।

### **উপসংহার:**

প্লেনে উঠে বউ বললো - খুব ভালো ঘুরলাম, আইসল্যান্ডে আসার তোমার সিদ্ধান্তটা একেবারেই যুক্তিযুক্ত। প্রত্যুত্তরে শুধু ঘাড় নাড়লাম, আংশিক খরচা চাওয়ার দুঃসাহসটা আর দেখিয়ে উঠতে পারিনি!





# Recent Events



36th Annual Seminar



36th Annual Seminar



36th Annual Seminar



Felicitation of speakers at  
36th Annual Seminar



A day with DSLR



Bijoya Sammelani Potluck



Bijoya Sammelani Potluck



Health Camp at Raisina School



Help Covid-19 Project



Health Camp at Raisina School



Help Covid-19 Project



Renukaji lake trip



Renukaji lake trip



Cricket match with BESU



Cultural program at Muktodhara



Film screening at Alumni office premises



Cultural program at Muktodhara



Cultural program at IIC



Cultural program at IIC



Picnic

*Thank you for your active participation*



*Rahul*

## ENGINEERING AND HEATER WORKS

**Ashok Rai**  
**Vikash Kumar**

Mobile : 9825494649  
9601446206



**Mfg : ALL TYPES OF ELECTRICAL HEATERS AND REPAIRING**

Gala No. 19, Tirpati Industrial Estate, 66KVA Road,  
Amli, Silvassa - 396 230. (D. & N. H.)

**Email : hariomengineering2012@gmail.com**

**This book is Designed & Printed By**



175, SECOND FLOOR, DESIDC SHED  
Okhla Industria Area, Phase-I.  
New Delhi - 110020,  
India

✉ : fvprintservices@gmail.com

☎ : + 91 9818900460

**Branch Office :**

■ **Mumbai**

■ **Kolkata**

■ **Bangalore**

---

[www.axitecsolar.com](http://www.axitecsolar.com)

**AXITEC**

**high quality german solar brand**

**Tanmoy Duari**  
**CEO**

**ENERGY FOR A BETTER WORLD**

[energy@axitecsolar.com](mailto:energy@axitecsolar.com)

[TD @ axitecsolar.com](mailto:TD@axitecsolar.com)

[www. axitecsolar.com](http://www.axitecsolar.com)

AXITEC Energy India Pvt Ltd.

S - 11, Star City Mall, Mayur Vihar, Ph - 1

New Delhi, India - 110019

Phone + 91 011 430 181 72

Mobile + 91 981 143 8740

---